الفهارسসূচীপত্র

পূর্বকথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

যাবতীয় প্রশংসা এক আল্লাহ্‌র জন্য। যাঁর কোন শরীক নেই। সমকক্ষ নেই। নেই কোন সহযোগী। যিনি শুধুমাত্র তাঁর একত্ববাদ তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিন ও মানুষ্য জাতি সৃষ্টি করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাওহীদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও শিক্ষক মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি যিনি তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের জন্য জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন।

তাওহীদ মানুষের উপর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় ফরয। ইহ-পরকালিন মুক্তি তাওহীদের বাস্তবায়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাওহীদের জ্ঞান না থাকলে কোন জ্ঞানই পরিপূর্ণ নয়। তাওহীদ বিহীন কোন আমলও গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ্ বলেন, (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْراً) "আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শুণ্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব।" (সূরা ফুরক্বান- ২৩)

তাওহীদই হল পারস্পরিক যোগসূত্রের সেতু বন্ধন রচনাকারী। তাওহীদ না থাকলে সকল সম্পর্ক মূল্যহীন। মানুষের ইতিহাসে ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্রের মাঝে বিচ্ছন্নতা ঘটেছে সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে শুধুমাত্র এই তাওহীদকে কেন্দ্র করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাওহীদ বিরোধী কর্মকান্ড তথা শির্কের সূচনা ঘটে নূহ (আ:) এর সম্প্রদায়ের মধ্যে। তিনি যখন জাতিকে তাওহীদের প্রতি আহবান জানালেন, শির্ক থেকে সতর্ক করলেন। তখন তারা বিষয়টিকে হাসি-ঠাট্টার সাথে উড়িয়ে দিল। তাঁর কথার কোনই মূল্যায়ন করল না। আল্লাহ্ তাদের প্রতি নাখোশ হলেন। প্রেরণ করলেন কঠিন আযাব- মহা প্লাবন। নূহ (আ:)কে আদেশ করলেন একটি কিশতী (নৌকা) তৈরী করার। নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেলে তিনি লোকদের তাওহীদের এই কিশতীতে আরহোণ করার আহ্বান জানালেন। বললেন, যে ব্যক্তি এই নৌকায় আরোহন করবে, সেই আল্লাহ্‌র আযাব থেকে পরিত্রান পেয়ে যাবে। তিনি বললেন, (ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، إِنَّ

(رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ "তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতিব ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান।" নৌকা এত বিশাল ছিল যে, পাহাড়সম তরঙ্গমালার মধ্যেও তা নির্বিঘ্নে চলতে পারত। নূহ (আ:)এর এক ছেলের নাম ছিল 'কেনআন'। সে তখনও নৌকায় আরোহণ করেনি। নূহ (আ:) প্লাবনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে পিতৃসুলভ স্নেহ বশতঃ ছেলেকে ডেকে বললেন, (يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا ولاَ تَكُنْ مَّعَ الكَافِرِيْنَ) "হে প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর; কাফেরদের সাথে থেকো না।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছেলে ছিল কাফের। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতাকে সে অস্বীকার করল। জবাব দিল, (سَآوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ) "আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।" কিন্তু পিতা সন্তানকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, (لاَ عَاصِمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ) "আজকে (কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ) কাউকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই।" এভাবে দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপাকথন চলছিল। (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ) "এই সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল। ফলে সে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল।" (সূরা হূদ- ৪১-৪৩) কি আশ্চর্য! পিতা আল্লাহ্‌র নবী হয়েও স্বীয় পুত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। কারণ পুত্র তাওহীদের কিশতী- মুক্তির নৌকায় আরোহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

বর্তমানে মুসলিম জাতি তাওহীদের বড় দাবীদার। 'আমরা তাওহীদী জনতা'। কিন্তু মুসলমানদের আমল-ইবাদতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়- তার অধিকাংশই তাওহীদ শুন্য। তাওহীদ সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অধিকাংশ আলেমেরই নেই। আর তাই তাওহীদ বিরোধী তথা শির্কী কথা ও কর্মকান্ড সমাজে ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ্যভাবে উক্ত শির্কের চর্চা করে থাকে। মসজিদে বসেই তারা শির্কী কর্মকান্ড পরিচালনা করে। তাবীজ লিখা, গণনা করে ভবিষ্যত সম্পর্কে মত প্রকাশ করা, বায়আত করার নামে শির্কী অসীলার প্রতি মানুষকে আহবান জানানো...। পীর-

মুশির্দদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে তাদেরকে আল্লাহ্র চাইতে অধিক ভালবাসা এবং তাদের কাছে বিপদাপদে সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করা..। তাদের উদ্দেশ্যে নযর-মান্নত করা.. ইত্যাদি।

এর চাইতে দুঃখ জনক বিষয় হল- আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো দূরের কথা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই তাওহীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। (দু'একটি ছাড়া) এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না; যেখানে তাওহীদ বা আক্বীদাহ্ নামে কোন পুস্তক সিলেবাসভুক্ত রয়েছে। বরং এমন অনেক মাদ্রাসা পাবেন, যা বিভিন্ন মাজার-কবর সংলগ্ন। অথচ উক্ত মাজার সমূহে সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাওহীদ বিরোধী শির্কের মহড়া। অবাধে পদদলিত হচ্ছে আল্লাহ্র অধিকার।

বক্ষমান পুস্তকটিতে লিখক অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে তাওহীদের বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। যা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় তাওহীদের প্রকৃতরূপ কি এবং বর্তমান মুসলমানদের বাস্তব পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে? বইটি আরবী ভাষায় পড়ে বাংলাভাষী ভাইদের জন্য তা উপস্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। যার ফলে আজ তা কিতাব আকারে আপনাদের সামনে উপস্থিত।

এ পুস্তক থেকে তাওহীদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকা যদি তাদের পিপাসা নিবারণের সামান্যতম সুযোগ লাভ করেন তবে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। একিতাবের লিখক, অনুবাদক এবং যারা তা প্রকাশ ও মুদ্রণের কাজে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন। এবং জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত সবাইকে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দিন। আমীন॥

আরয গুযার,
মুহা: আবদুল্লাহ্ আল কাফী
লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সঊদী আরব
পোঃ বক্স নং- ১৫৮০, ফোনঃ ০৩- ৩৬২৫৫০০ এক্সঃ ১০১১
Email: mohdkafi12@yahoo.com

লেখকের ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি। অতঃপর:

প্রথম ব্যক্তিঃ চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে আমার পাশে উপবেসন করল। বলল, শায়খ! এই প্রবাস জীবনে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি বললাম, দু'আ করি আল্লাহ্ দ্রুত আপনাকে স্বদেশে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

তার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বলল, শায়খ! আল্লাহ্‌র কসম আপনি যদি জানতেন পরিবারের প্রতি আমার আগ্রহ এবং আমার প্রতি তাদের আগ্রহ কিরূপ!

শায়খ আপনি কি বিশ্বাস করবেন, আমার মাতা উমুক ওলীর কবরের কাছে আমার জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে চার'শ মাইলের বেশী পথ সফর করেছেন। তিনি দু'আ করেছেন, আমাকে যেন তার কোলে ফিরিয়ে দেয়া হয়..! উক্ত ওলী খুবই বরকতময় ব্যক্তি। তাঁর দু'আ কবূল হয়, বিপদ দূরীভূত করা হয়.. এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও।

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ শায়খ আল্লামা আবদুল্লাহ্ বিন জাবরীন আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদা আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। ইহ্‌রামের কাপড়ে মানুষের শরীর আবৃত। সে সময় তারা বিনয়াবনত হৃদয়ে মহান মালিকের দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আয় রত। অশ্রু প্লাবিত করছে তাদের দু'চোখ। তিনি বলেন, আমরা যখন আল্লাহ্‌র করুণা ধারা নাযিলের জন্য প্রার্থনায় ব্যাকুল, এমন সময় আমার দৃষ্টি আকর্ষন করল জনৈক লোক। লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ। বয়সের ভার তার শরীরে সুস্পষ্ট। শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু সে প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করে বার বার উচ্চারণ করছে, হে উমুক ওলী.. আপনি আমার বিপদ দূর করে দিন!.. আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করুন!!.. আমাকে দয়া করুন!!!.. সে রোনাজারী করছে এবং চোখের পানি ফেলে সাদা দাড়ি ভিজিয়ে ফেলছে..।

তার এসব কথা শুনে যেন আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আমি মনের অজান্তে চিৎকার করে উঠলাম। বললাম, আল্লাহ্‌কে ভয়

কর! কিভাবে তুমি গাইরুল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছ!? গাইরুল্লাহ্‌র কাছে প্রয়োজন পূরণের আবেদন পেশ করছ!? এ ওলী তো তোমার মতই একজন মাখলুক। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তাঁর মালিকানাধিন একজন গোলাম-দাস। সে তো তোমার কোন কথা শুনতে পায় না, তোমার ডাকেও সাড়া দিতে পারবে না। এক আল্লাহ্‌কে ডাক! তার সাথে শরীক করনা!!

বৃদ্ধ আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, এই বুড়ো! দূর হও তুমি!! তুমি তো জাননা আল্লাহ্‌র কাছে সেই ওলীর কি মর্যাদা। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে এই ওলীর অনুমতি ছাড়া আসমান থেকে বৃষ্টির ফোটা পড়েনা.. যমীন থেকে কোন উদ্ভিদ উদগত হয় না..।

শায়খ বলেন, আমি বললাম, তুমি যা বললে তা হতে আল্লাহ্ অতি মহান এবং পবিত্র। তুমি আল্লাহ্‌র জন্য কি অবশিষ্ট রাখলে? আল্লাহকে ভয় কর! সে আমার একথা শুনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেখান থেকে চলে গেল।

এভাবে তৃতীয় ব্যক্তি, চতুর্থ, পঞ্চম ব্যক্তি.. তাদের ঘটনা আপনি এবইয়ের পাতায় পাতায় পাবেন। 'সুবহানাল্লাহ্' কোথায় তারা যারা গাইরুল্লাহ্‌র দিকে দৌড়াচ্ছে? মৃত গলিত মানুষের নিকট বিপদ উদ্ধারের জন্য দরখাস্ত পেশ করছে? প্রয়োজন পূরণের জন্য ছুটাছুটি করছে? আহা, তারা মহান ফরিয়াদ শ্রবণকারী আল্লাহ্ থেকে কত জোযন জোযন মাইল দূরে! যিনি সত্য, সুমহান ও প্রতাপশালী বাদশার বাদশা। যিনি মাতৃগর্ভে ভ্রুণের নাড়াচাড়া অবলোকন করেন। দুঃখী ও বিপদগ্রস্থের দু'আ শুনে থাকেন। তাঁর বান্দা তিনি ছাড়া কাউকে আহবান করবে তিনি কখনই তাতে সন্তুষ্ট নন।

আপনি যদি ক্রন্দন করতে চান তবে উম্মতের বর্তমান অবস্থা দেখে ক্রন্দন করুন। মুসলিম দেশ সমূহে আপনি নযর বুলান। কি দেখবেন? দেখবেন কবর-মাজারের ছড়াছড়ি। দরবার, মকাম, খানকা, আস্তানায়.. শহর-বন্দর ভরপুর। এ সমস্ত স্থান যেন বিপদগ্রস্থ, সঙ্কটাপন্ন মানুষের আশ্রয় স্থল- শেষ ভরসা। চোখ খোলার পর থেকেই শিশু শির্কের এসমস্ত আখড়া দেখে অভ্যস্ত হয়েছে। আর তা চর্চা করতে করতেই জীবন- যৌবন অতিবাহিত করছে- বার্ধক্যে পৌঁছেছে।

আমাদের এ বক্তব্য, এ আহবান, চিৎকার, কাতুতি-মিনতি, বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ সে সকল লোকের খেদমতে যারা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় আছাড়

খাচ্ছে, অন্ধকার গলিতে বিভ্রান্ত দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে এবং নাজাতের কিশতীর সন্ধান না পেয়ে মুশরিক অবস্থাতেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যাচ্ছে। অথচ তারা মনে করে যে, মুসলমানই রয়ে গেছে।
নিশ্চয় এই তাওহীদের কিশতী, নূহের কিশতীর মত। যারা সে সময় তাতে আরোহণ করেছিল তারাই মুক্তি লাভ করেছিল। যারা তা থেকে দূরে থেকেছিল তাদের সলিল সমাধি ঘটিছিল। মুসলিম দেশ সমূহে আমরা কতই না ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখেছি, দুনিয়ার জীবনে কৃত আমল সমূহ যাদের বরবাদ হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে করে যে আমরা ভালই আমল করছি।
তাই এই পুস্তকের মাধমে সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহবান! আসুন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্ব করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল উরাইফী
পোঃ বক্স নং ১৫১৫৯৭, রিয়াদ- ১১৭৭৫
সঊদী আরব।
Email: arefe@arefe.com

উত্তাল সমুদ্র

দুনিয়াটা মুশরেকদের দ্বারা ছিল পরিপূর্ণ। চারদিকে যেন শির্ক ও মূর্তী পূজার জয়জয়কার। কেউ করত মূর্তী পূজা, কেউ কবর পূজা, কেউ মানুষের দাসত্ব করত আবার কেউ গাছের উপাসনা করত।

তাদের রব তা দেখে রাগম্বিত হলেন। কেননা আরব-অনারব সকলের একই অবস্থা। অবশ্য গুটিকতক আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) তখনও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঐ সমস্ত মুশরেকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় জনৈক ব্যক্তি। নাম আমর বিন জামূহ। 'মানাফ' নামে তার একটি মূর্তী ছিল। সে তার সামনে সিজদা করত, তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। 'মানাফ'ই ছিল বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারকারী, প্রয়োজনে আশ্রয় দান কারী। কাঠ দিয়ে বানানো একটি মূর্তী। কিন্তু সেটাই ছিল তার নিকট পরিবার পরিজনের চাইতে বেশী প্রিয়। তার সম্মান ও তা'যীমে, সাজগোজে, সুগন্ধি লাগাতে, পোষাক পরাতে অঢেল অর্থ ব্যয় করত। যখন থেকে সে দুনিয়াটা চিনতে শিখেছে এটাই ছিল তার স্বভাব চিত্র। এভাবে সে ষাট বছর বয়সে পদার্পণ করল।

মানুষকে শির্কের শৃংখল থেকে মুক্তি দানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে মক্কায় নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। তারপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুছআব বিন উমাইরকে (রা:) ইসলামের দাঈ এবং শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করলেন মদীনায়। তাঁর দা'ওয়াতে আমর বিন জামূহের তিন ছেলে তাদের মাতাসহ ইসলাম কবূল করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমর কিছুই জানল না।

একবার ছেলেরা পিতার কাছে গিয়ে ইসলামের দাঈ ও শিক্ষক সম্পর্কে সংবাদ পেশ করলেন এবং তার সামনে কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তারা বললেন, অগণিত মানুষ তো এ লোকটির দা'ওয়াত গ্রহণ করছে, তাঁর অনুসরণ করছে। তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে আপনার মত কি?

সে বলল, আমি তা করতে রাযী নই যে পর্যন্ত মূর্তী 'মানাফের' কাছে পরামর্শ না করি। তারপর আমর মানাফের কাছে গেল- তারা যখন কোন মূর্তীর সাথে

কথা বলত, তখন একজন বুড়ীকে মূর্তীর পিছনে বসিয়ে রাখত। তাদের ধারণানুযায়ী মূর্তী সেই বুড়ীকে যা ইলহাম[১] করত, বুড়ী সে অনুযায়ী কথা বলত।

আমর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মানাফের কাছে গেল- ওর এক পা অপরটি থেকে খাট ছিল- তারপর মূর্তীর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজের ভাল পায়ের উপর ভর করে তার সামনে দন্ডায়মান হল। এরপর মূর্তীর প্রশংসা করল ও গুণগাণ গাইল এবং বলল, হে মানাফ! সন্দেহ নেই মদীনায় নতুন আগমণকারী সম্পর্কে তুমি অবগত আছ। সে তুমি ছাড়া কারো সাথে খারাপ আচরণ করে না। তোমার উপাসনা করতে সে আমাদেরকে নিষেধ করে। আমি এখন কি করব হে মানাফ? মূর্তী কোন জবাব দিল না। আমর আগের কথাগুলো পূণরাবৃত্তি করল। কিন্তু কোন জবাব পেল না। তখন আমর বলল, সম্ভবত: তুমি আমার উপর রাগম্বিত হয়েছো। ঠিক আছে আমি তোমাকে বেশী বিরক্ত করব না, যখন তোমার ক্রোধ থেমে যাবে, আবর আসব। একথা বলে সে বেরিয়ে গেল।

রাতের আঁধার নেমে এল। আমরের ছেলেরা মানাফের কাছে এসে তাকে নিয়ে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। গর্তটিতে সাধারণতঃ মৃত প্রাণী ও ময়লা-আবর্জনা ফেলা হত। সকালে আমর মূর্তীর ঘরে গেল। উদ্দেশ্য তাকে সালাম করা। কিন্তু একি? মানাফ কোথায়? আমার মা'বূদ? চিৎকার করে বলল, তোমরা ধ্বংস হও! গতরাতে কে আমার মাবূদের সাথে শত্রুতা করেছো? পরিবারের কেউ কোন কথা বলল না। সে ভীত হয়ে গেল, চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে মূর্তীর অনুসন্ধানে বের হল। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর শেষে দেখতে পেল মূর্তী একটি গর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে তাকে বের করে নিয়ে এল এবং পরিস্কার করে আগের স্থানে সুন্দর করে রেখে দিল। মূর্তীকে লক্ষ্য করে বলল, মানাফ তুমি যদি বলতে কে তোমার সাথে এ দূর্ব্যবহার করেছে, তবে তাকে আমি লাঞ্ছিত করতাম।

রাত এল। ছেলেরা আবার মূর্তীটিকে নিয়ে সেই দূর্গন্ধময় গর্তে নিক্ষেপ করল। সকালে বৃদ্ধ আমর মূর্তীর খোঁজে গিয়ে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পেল না। ক্রোধে চিৎকার করে উঠল এবং নানাভাবে পরিবারের লোকদেরকে ধমকাল এবং

---

[১]. হৃদয়ে ঐশী কোন ঈঙ্গিতের উদ্রেক হওয়াকে ইলহাম বলা হয়।

শাস্তির অঙ্গীকার করল। তারপর মূর্তীকে উক্ত গর্ত থেকে নিয়ে এসে গোসল করিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে যথাস্থানে সম্মানের সাথে রেখে দিল।

প্রতি রাতেই ছেলেরা মূর্তীর সাথে এরূপ আচরণ করতে থাকে আর সকালে আমর তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে যত্ন করে। এক পর্যায়ে যখন সে খুব সংকীর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন একদিন মূর্তীকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার ধ্বংস হোক হে মানাফ! একটি ছাগলও তো নিজ নিতম্বের হেফাযত করতে পারে! তারপর মূর্তীর মাথার কাছে একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, এ তলোয়ার দ্বারা শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে...।

আবার রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল। ছেলেরা মূর্তীটিকে একটি মৃত কুকুরের দেহের সাথে বেঁধে দুর্গন্ধময় একটি কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করল। সকালে আমর মানাফের খোঁজে বের হয়ে যখন দেখল কুপের মধ্যে তার এই অবস্থা, তখন দুঃখ করে বলল,

ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب

'এমন রব যার মাথায় খেঁক শিয়াল পেশাব করে!

নিশ্চয় এধরণের রব অকৃতকার্য যার উপর খেঁকশিয়াল পেশাব করে।'

অতঃপর আমর বিন জামূহ্ ইসলাম গ্রহণ করলেন। দ্বীনের ময়দানে নেককারদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লেন। দেখুন তাঁর অবস্থা- ঈমানী জযবা। যখন মুসলিমগণ বদরের যুদ্ধে বের হলেন, তখন ছেলেরা তাকে বাঁধা দিল। কারণ তিনি বৃদ্ধ। তাঁর পা খোঁড়া। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র পথে জিহাদে যেতে জিদ ধরলেন। ছেলেরা বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর কাছে গিয়ে বললেন। তিনি তাকে মদীনাতেই থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাধ্য হয়ে তিনিও নির্দেশ শিরধার্য করলেন।

এল ওহুদ যুদ্ধ। আমর (রা:) জিহাদের জন্য বরে হতে চাইলেন। ছেলেরা বাধা দিতে চাইল। তখন তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর কাছে গিয়ে নিজের দৃঢ় ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। বললেন, ছেলেরা আপনার সাথে জিহাদে যেতে আমাকে নিষেধ করছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্ তো আপনাকে (বৃদ্ধ ও খোঁড়া হওয়ার কারণে) যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আশা করছি আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করব। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিহাদে

বের হওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি স্বীয় অস্ত্র ধারণ করলেন এবং দু'আ করলেন, (اللهُمَّ ارْزُقْنِيْ الشَّهَادَةَ ولاتَرُدَّنِيْ إلَى أهْلِيْ) হে আল্লাহ্! আমাকে শাহাদাতের সুধা পান করাও। পরিবারের কাছে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো না।

যখন সৈন্য বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করল। দু'দল একত্রিত হল। যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করল। অস্ত্রের ঝনঝনানীতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। আমর (রা:) স্বীয় তরবারী নিয়ে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। মূর্তী পূজারীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত জনৈক কাফের তার দিকে অগ্রসর হয়ে তরবারীর আঘাতে তাঁকে শহীদ করে দিল। আমর (রা:)কে দাফন করা হল। তিনি শামিল হলেন সেই সব ব্যক্তিদের কাতারে যাদের উপর আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন।

৪৬ বছর পর। মুআ'বিয়া (রা:)এর শাসনামল। ওহুদের শহীদদের কবরস্থানে প্রচন্ড বন্যা দেখা দিল। সমস্ত কবর প্লাবিত হয়ে গেল। মুসলমানগণ শহীদদের লাশ স্থানান্তর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। যখন আমর বিন জামূহের (রা:) কবর খনন করা হল দেখা গেল, তিনি যেন ঘুমন্ত.. তাঁর শরীর নরম.. পার্শ্বদেশ একটু বাঁকা হয়ে আছে। মাটি তার শরীরের কোন কিছুই নষ্ট করে নি।

চিন্তা করুন! আল্লাহ্ কিভাবে তার শেষ আঞ্জাম (পরিণতি) সুন্দর করেছেন- যখন তিনি সত্য গ্রহণ করেছেন। বরং দেখুন আখেরাতের আগেই কিভাবে আল্লাহ্ তার কারামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন- যখন কিনা তিনি কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'কে বাস্তবায়ন করেছেন। এটা তো সেই কালেমা যার জন্য আসমান-যমীন সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত জগত আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। একালেমাই হল জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। এর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম। বিভক্ত হয়েছে মানব জাতি দু'ভাগে মুমিন ও কাফের, বা নেককার ও বদকার।

বান্দার দু'পা আল্লাহ্র সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত সে দু'টি প্রশ্নের উত্তর না দিবে। তোমরা কার ইবাদত করতে? তোমরা রাসূলদের (বা তার প্রতিনিধিদের) আহ্বানের কি জবাব দিয়েছ?

***

নাজাতের কিশতী

আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা একত্ববাদকে না বুঝার কারণে তা বাস্তবায়ন না করার করণে, কত লোকই না ধ্বংস হয়ে গেছে! কত মানুষই না ক্বিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েছে!

আল্লাহ্‌ই একক রব মালিক। তিনি ছাড়া কারো প্রতি বান্দা ভরসা করবে না। তিনি ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী হবে না। তাঁকে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। তাঁর নাম ছাড়া কারো নামে শপথ করবে না। নযর-মানত তাঁর নামেই করবে। একমাত্র তাঁর কাছেই তওবা করবে। এটাই হল তাওহীদের বাস্তবায়ন। ‘লাইলাহা ইল্লাহ্‌র’ সাক্ষ্য দানের যথার্থতা। একারণেই আল্লাহ্‌ তা‘আলা জাহান্নাম হারাম করেছেন এমন ব্যক্তির উপর যে সঠিকভাবে এ সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করেছে।

দেখুন! মু’আয বিন জাবাল (রা:) যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে পিছনে চলছিলেন, হঠাৎ নবীজি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, হে মু’আয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক (দাবী) কি আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার দাবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

(حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)

“বান্দার উপর আল্লাহ্‌র দাবী হল- তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার দাবী হল- যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে অংশী নির্ধারণ করবে না তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না।” (বুখারী ও মুসলিম)

(عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)

আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসঊদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড়

পাপ কোনটি? তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহ্‌র জন্য কোন শরীক নির্ধারণ করবে। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

***

হ্যাঁ, তাওহীদই তো হল এমন বিষয়, যা বাস্তবায়ন ও প্রচার-প্রসার করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আর প্রত্যেক জতির কাছে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাগূত থেকে দূরে থাকবে।" (সূরা নাহাল- ৩৬) তাগূত হল প্রত্যেক এমন বস্তু, আল্লাহ্ ছাড়া যার দাসত্ব করা হয়- মূর্তী বা পাথর বা কবর বা গাছ... ইত্যাদি। তাওহীদের দা'ওয়াতই হল নবী-রাসূলদের প্রথম দায়িত্ব। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾

"আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি রহমান ছাড়া অন্য কাউকে তাদের জন্য মা'বূদ নির্ধারণ করেছি- যার তারা ইবাদত করবে?" (সূরা যুখরুফ- ৪৫)

বরং জগত তো শুধু এজন্যই সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র তাওহীদকে বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।" (সূরা যারিয়াত- ৫৬)

প্রত্যেকটি ইবাদত গৃহীত হওয়া তাওহীদের উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"তারা যদি শির্ক করে, তবে তাদের আমল সমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে।" (আন'আম-৮৮)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদের বাস্তবায়ন করবে সেই মুক্তি পাবে। যেমন হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً)

“যে ব্যক্তি আমার কাছে হাজির হবে পৃথিবী পূর্ণ পাপরাশি নিয়ে- এমতাবস্থায় যে, সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তবে পৃথিবী পূর্ণ মাগফিরাত নিয়ে আমি তার সামনে উপস্থিত হব।” (মুসলিম, তিরমিযী হা/ ৩৪৬৩)

তাওহীদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক বিবেচনা করে নবীগণও সে সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। দেখুন না! তাওহীদের পিতা, মূর্তী চূর্ণকারী, কাবা শরীফের নির্মাণকারী ইবরাহীম (আ:) কত বিনয়ের সাথে দু‘আ করেছেন মহান মালিকের দরবারে, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ “(হে আল্লাহ্) আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তীর ইবাদত থেকে দূরে রাখ।” (সূরা ইবারহীম- ৩৫) সুতরাং ইবরাহীম (আ:)এর পর কে এমন আছে যে ঐ ব্যাপারে নিরাপদে থাকবে?

*****

বিভ্রান্তির সূচনা

সর্বপ্রথম শির্কের সূচনা হয় নূহ (আ:)এর জাতির মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ:)কে তাদের মাঝে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করতে নিষেধ করলেন। যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করে আল্লাহ্র একত্বকে মেনে নিল, সে মুক্তি পেল। আর যে শির্কের উপর প্রতিষ্ঠিত রইল, আল্লাহ্ তাকে মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন। নূহ (আ:)এর পর মানুষ বহুকাল তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর ইবলীস আবার তাওহীদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। ফলে মানুষের মাঝে আবার শির্ক ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করতে থাকলেন। তাঁরা মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন এবং জাহান্নামের ভয় দেখালেন। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করা হল। তিনি মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানালেন। মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ (সশস্ত্র যুদ্ধ) করলেন। মূর্তী ভেঙ্গে চুরমার করলেন।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর ওফাতের পর মানুষ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে চলতে থাকল। এরপর কিছু লোকের মধ্যে আবার শির্কের প্রকাশ ঘটল। যার মূল কারণ ছিল ওলী-আওলিয়া এবং নেক লোকদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন। ফলে তাদের কবর সমূহে ঘর তৈরী হল, গম্বুজ বানানো হল, বিবেক বর্জিতভাবে কবরে মোমবাতি-আগরবাতী জ্বালানো হল, কবরকে পাকা করেই শেষ নয় তাকে লাল/সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেঁকে দেয়া হল, উপরে টানানো হল মশারী (কি হাঁস্যকর ব্যাপার!) এবং শেষে শুরু হল সে সমস্ত কবরে প্রকাশ্য শির্ক। মানুষ তাদের কাছে দু'আ চায়। তাদের কাছে বিপদ-আপদে উদ্ধার কামনা করে, সন্তান পাওয়ার আশায় তাদের মাজারে ধর্ণা দেয়, তাদের মাজারকে উদ্দেশ্য করে নযর-মানত করে...।

তারা এ শির্কের নাম রাখল নেক লোকদের ওসীলা বা মধ্যস্থতা। তাদের ধারণা অনুযায়ী এ হল নেক লোকদের প্রতি ভালবাসা। তারা মনে করল, এভাবে তাদেরকে ভালবাসলে এবং তাদের কবর সমূহকে সম্মান করলে আল্লাহ্র নৈকট্য

পাওয়া যাবে। তারা ভুলে গেল ঠিক এ কথাই ছিল প্রথম যুগের মুশরিকদের। মূর্তী পূজা সম্পর্কে তারা বলেছিল,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"আমরা তো তাদের ইবাদত এজন্যই করি যে, তারা (এ মূর্তীগুলো) আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করবে।" (সূরা যুমার- ৩)

আশ্চর্যের বিষয় হল আপনি যদি বর্তমান যুগের কবর পূজারী এ মুশরিকদের কর্যাবলীর প্রতিবাদ করতে যান, তারা আপনাকে বলবে, আমরা তো তাওহীদ পন্থী, আমাদের পালনকর্তার ইবাদত করি। তারা ভাবে তাওহীদ অর্থ একথার স্বীকারোক্তি দেয়া যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আছে, তিনি স্রষ্টা, হায়াত-মওতের মালিক, আর তিনিই ইবাদত পাওয়ার বেশী হকদার অন্যরা নয়। তাওহীদ সম্পর্কে এটি একটি ভুল ধারণা। কেননা এ অর্থ অনুযায়ী আবু জাহাল, আবু লাহাবও ছিল তাওহীদপন্থী। কেননা তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে বড় মাবূদ। তিনি সব ইবাদতের হক্বদার। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মাবূদকে শরীক করত, এই বিশ্বাসে যে, তারা (ঐ মাবূদগণ) তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছিয়ে দিবে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে শুপারিশ করবে।

*****

একটি ঘটনা

হাসান সনদে ইমাম বাইহাক্বী বর্ণনা করেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মানুষের মাঝে তাওহীদের দা'ওয়াত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন কুরায়শগণ নানা প্রকার চেষ্টা চালালো মানুষকে তাঁর দাওয়াত থেকে বিমুখ করতে। তারা বলল, ইনি যাদুকর.. জ্যোতির্বিদ.. পাগল..। কিন্তু পরিণামে তারা দেখল তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কমে তো না; বরং দিন দিন বেড়েই চলছে। অতঃপর তারা ঐক্যমত হল, তাঁকে সম্পদ ও দুনিয়ার প্রাচুর্য দিয়ে বিভ্রান্ত করবে। এ প্রস্তাব পেশ করার জন্য 'হুছাইন বিন মনুযির আল খোযাঈ' নামক জনৈক মুশরিককে তাঁর কাছে পাঠালো। সে ছিল মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

হুছাইন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গিয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছো... আমাদের একতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছো.. তুমি আমাদের মাঝে ফেতনা সৃষ্টি করেছো... এটা করেছো.. ওটা করেছো..। তুমি যদি সম্পদ চাও তবে বল আমরা মাল-দৌলত একত্রিত করে তোমাকে আমাদের মাধ্যে সবচেয়ে বড় মালদার বানিয়ে দেই। যদি নারী চাও তবে সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেই। যদি তুমি আমাদের বাদশাহ হতে চাও তবে তোমাকে আমাদের বাদশাহ্ বানিয়ে দেই। এভাবে সে নানারকম প্রলোভন মূলক কথা বলতে থাকল। আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনতে থাকলেন।

সে যখন কথা শেষ করল, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার কথা কি শেষ হে আবু ইমরান? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সে বলল, আপনি কি চান প্রশ্ন করুন?

তিনি বললেন: হে আবু ইমরান, তুমি কয়জন মা'বূদের ইবাদত করে থাক?

হুছাইন বলল: সাতজন। ছয়জন পৃথিবীতে আর একজন উর্ধাকাশে।

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার সম্পদ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কার কাছে তা চাও?

সে বলল: যিনি আকাশে আছেন তার কাছে চাই।

নবীজি প্রশ্ন করলেন: যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তবে?

হুছাইন জবাব দিল: যিনি উপরে আছেন তার কাছে বৃষ্টি চাই।

নবীজি বললেন: যদি তোমার সংসারে অভাব দেখা দেয় তবে কাকে আহ্বান কর?

সে বলল: যিনি আসমানে আছেন তাকে।

নবী পাক বললেন: তবে তিনিই একাই তোমার সব আহ্বানে সাড়া দেন? না কি তারা (বাকী ছয়জন) সবাই?

হুছাইন উত্তর দিল: তিনি একাই সব ধরণের ডাকে সাড়া দেন।

তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তিনি একাই তোমার আহ্বানে সাড়া দেন, একাই তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেন.. আর তুমি কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে থাক? নাকি তুমি ভয় কর যে ওরা (অন্য মাবূদগণ) তোমার ব্যাপারে তাঁকে (আল্লাহ্কে) পরাজিত করে দেবে।

হুছাইন বলল: না, তারা তা করার ক্ষমতা রাখে না।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হে হুছাইন! তুমি ইসলাম কবূল কর। আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমার উপকার করবেন।.. (হাদীছটির মূল সুনান তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে হা/৩৪০৫)

****

বন্দী সত্যের সাক্ষ্য দিল

হ্যাঁ তারা লাত, মানাত, ওজ্জার উপাসনা করত। কিন্তু তারা মনে করত এগুলো ছোট মা'বূদ। এরা তাদেরকে মহান মা'বূদ আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করবে। তাই তারা বিভিন্ন ধরণের দাসত্ব তাদেরকে উপহার দিত। যাতে করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে। একারণে তারা বলত,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"আমরা তো তাদের ইবাদত এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করবে।" (সূরা যুমার- ৩) তারা আরো বলত, (هَؤُلاَءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللهِ) "এরা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস- ১৮) তারা বিশ্বাস রাখত, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ হলেন স্রষ্টা, রিযিক দাতা, জীবন-মরণের মালিক। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (সূরা লোকমান-২৫)

ছহীহ্ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নজদ অভিমূখে অশ্বারোহী এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। যেন তারা মদীনার চতুর্দিকে কি ঘটছে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তারা যখন ঘোড়ায় চড়ে টহল দিচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেল জনৈক ব্যক্তি তার অস্ত্র একটি গাছে লটকিয়ে রেখে ইহরামের কাপড় পরিধান করছে আর তালবিয়া পাঠ করছে, "লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লাশারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান, হুয়া লাকা, তামলেকুহু ওয়ামা মালাক...." [তোমার দরবারে হাজির, হে আল্লাহ্ তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। তবে সেই শরীক ব্যতীত যা তোমারই জন্যে, তুমি তার মালিক এবং সে যার মালিক হয়েছে তারও মালিক...।] সে বারবার

উক্ত তালবিয়া পাঠ করছে। অশ্বারোহী ছাহাবীগণ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, মক্কা। তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ছাহাবীগণ বুঝলেন যে, সে নবুওতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা কায্যাবের এলাকা থেকে এসেছে। তারা তাকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এলেন। যাতে করে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অবস্থা বুঝে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা জান কাকে তোমরা বন্দী করেছো? এ হচ্ছে 'ছুমামা বিন উছাল', বনূ হানীফ গোত্রের সরদার। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন, মসজিদের এক খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখতে এবং তার যথাযথ সম্মান করতে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় গৃহ থেকে খাদ্য-পানীয় যা ছিল একত্রিত করে তার কাছে পাঠালেন। আর ছুমামার আরোহী সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন তাকে যেন ঘাস-খড় দেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া হয়। আর আরোহীটি যেন তার সামনে সকাল-সন্ধায় একবার করে পেশ করা হয়। নির্দেশ মোতাবেক ছাহাবীগণ তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, কি খবর তোমার ছুমামা!? সে বলল, আমার খবর ভাল হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি আমায় হত্যা করেন, তবে আমার কওম সে প্রতিশোধ নিবে। আর যদি অনুগ্রহ করেন তবে আপনার অনুগ্রহ হবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি। আর যদি সম্পদ চান, তবে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। পরদিন আবার তার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, ছুমামা কি খবর তোমার? সে বলল, আমার খবর ইতপূর্বে আপনাকে বলেছি যদি আমায় হত্যা করেন, তবে আমার কওম সে প্রতিশোধ নিবে। আর যদি অনুগ্রহ করেন তবে আপনার অনুগ্রহ হবে একজন কৃতজ্ঞের প্রতি। আর যদি সম্পদ চান, তবে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর কথা বাড়ালেন না। পরদিন আবার এসে প্রশ্ন করলেন, ছুমামা কি খবর তোমার? সে বলল আমার যা কথা ছিল তা আপনাকে বলেছি।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দেখলেন তার মধ্যে ইসলামের প্রতি কোন আগ্রহ নেই; অথচ সে মুসলমানদের ছালাতের দৃশ্য অবলোকন করেছে। তাদের কথাবার্তা শুনেছে। তাদের দয়া-দাক্ষীণ্য প্রত্যক্ষ্য করেছে তখন ছাহাবীদেরকে

নির্দেশ দিলেন, ছুমামাকে ছেড়ে দাও। তারা তাকে ছেড়ে দিলেন এবং সাথে অশ্বটিও দিয়ে দিলেন। ছুমামা চলে গেল। তারপর মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি কুপের কাছে গিয়ে গোসল করল। অত:পর আবার মসজিদে ফিরে এল এবং ঘোষণা দিল "আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্।" আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল।

এরপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে লক্ষ্য করে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র শপথ যমীনের বুকে আপনার চেহারার চেয়ে ঘৃণীত কোন চেহারা আমার কাছে ছিল না। এখন এই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে আপনার চেহারার চেয়ে প্রিয় আর কোন চেহারা আমার কাছে নেই...। আল্লাহ্র শপথ আপনার ধর্মের চেয়ে ঘৃণীত কোন ধর্ম আমার কাছে ছিল না। এখন এই মুহূর্তে আপনার ধর্মের চেয়ে প্রিয় কোন ধর্ম আমার কাছে দ্বিতীয়টি নেই। আল্লাহ্র শপথ আপনার শহরের চেয়ে ঘৃণীত কোন শহর আমার দৃষ্টিতে ছিল না। এখন এই মুহূর্তে আপনার শহরের চেয়ে প্রিয়তম কোন শহর আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি নেই। তারপর ছুমামা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে; অথচ আমি ওমরা পালন করার ইচ্ছা করেছিলাম। আপনি আমার ব্যাপারে এখন কি বলেন?

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন সফর পূরা করার এবং মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় করার।

ছুমামা মক্কা গেলেন। মুখে তার তাওহীদী তালবিয়া: "...লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইকা... লা শারীকা লাকা.." তোমার দরবারে হাজির হে আল্লাহ্ তোমার কোন শরীক নেই.. তোমার কোন শরীক নেই..।

হ্যাঁ ছুমামা মুসলমান হয়েছেন। তিনি আল্লাহ্র নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা দিচ্ছেন, .. তোমার কোন শরীক নেই..। সুতরাং আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে কোন কবরের ইবাদত নয়। কোন মূর্তী নয় যার জন্য ছালাত হবে, সিজদা হবে।

তারপর ছুমামা মক্কা প্রবেশ করলেন। তার আগমণের খবর কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কানে পৌঁছে গেল। তারা স্বাগতম জানাতে এগিয়ে এল। কিন্তু একি শুনছে তারা? "...লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইকা... লা শারীকা লাকা.."?

একজন প্রশ্ন করল, তুমি কি ধর্ম ত্যাগ করেছো? তিনি বললেন, না; বরং আমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

একথা শুনে তারা ইচ্ছা করল, তাকে কষ্ট দিবে। ব্যাপার খারাপ দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন: আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি ইয়ামামা থেকে তোমাদের জন্য গমের একটি দানাও আসবে না- যে পর্যন্ত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা না দেন। তারা মূর্তী মা'বূদদের সম্মান করার চাইতে আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক সম্মান করত। (এজন্য আল্লাহ্‌র শপথের কথা শুনে তারা দমে গেল)

প্রিয় পাঠক! আপনি আমাকে বলুন আবু জাহেল ও আবু লাহাবের শির্ক ও বর্তমান যুগের লোকদের শির্কের মাঝে কি পার্থক্য? যারা কবরের কাছে পশু যবেহ্ করে বা মাজারের দরজায় সিজদা করে বা পশু যবেহ্ করে বা তার তওয়াফ করে, বা কোন ওলীর দরবারে গিয়ে বিনীত মস্তকে, ভীত-সন্ত্রস্ত মন নিয়ে দন্ডায়মান হয়। সেখানে গিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিপদে উদ্ধার পাওয়ার আশায় দরখাস্ত করে, রোগ মুক্তি কামনা করে...।

আশ্চর্যের বিষয়! অথচ আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে ডাক (যাদের ইবাদত কর) তারা তো তোমাদের মতই বান্দা; তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক তো- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আ'রাফ- ১৯৪)

****

এই যে আজকাল কবরে-মাজারে শির্ক হচ্ছে। যেমন সেখানে পশু যবেহ করা, কবরবাসীর কাছে দু'আ চাওয়া, তাদের নৈকট্য কামনা করা, তাদের তওয়াফ করা, তাদের কাছে সন্তান.. রোগ মুক্তি ইত্যাদি কামনা করা... এগুলো সবচেয়ে বড় পাপ। হ্যাঁ বরং এ পাপগুলোর ভয়াবহতা ও শাস্তি যেনা-ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক, মদ্যপান, খুন, পিতামাতার অবাধ্যতার চাইতে কঠিন ও ভয়ংকর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না যে তার সাথে শির্ক করে। আর তিনি এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা নিসা- ৪৮/১১৬)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ শির্কের পাপ ক্ষমা করবেন না। কিন্তু হতে পারে ইচ্ছা করলে তিনি ব্যভিচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। খুনী, অপরাধীকে চাইলে মুক্তি দিতে পারেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম) বলেছেন, “বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যভিচারীনী একদা মরুভুমি দিয়ে চলছিল। দিনটি ছিল কঠিন গরম। ইতমধ্যে সে দেখতে পেল একটি কুকুর কঠিন তৃষ্ণায় হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় যেন মারা যাবে। জিহ্বা বের করে সে একটি কুপের কাছে একবার তার উপর উঠছে একবার তার চতুর্দিকে ঘুরছে। ব্যভিচারীনী তার এ পরিস্থিতি দেখে নিজের জুতা খুলে ওড়ানায় বেঁধে কুপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরকে পান করাল। তার এ কাজের কারণে আল্লাহ্ খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহ্ ব্যভিচারীনীকে? যে কিনা অশ্লীল-অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকত! হারাম উপার্জন থেকে পানাহার করত! কিন্তু কেন? সে কি রাত জেগে ছালাত আদায় করত? সারা দিন নফল ছিয়াম পালন করত? সে কি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে? কখনোই না। সে তো একটি পিপাষার্ত কুকুরকে এক ঘোট পানি পান করিয়েছে। আর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। যদিও সে আল্লাহ্র নাফারমানীতে লিপ্ত থাকত; কিন্তু সে আল্লাহ্র সাথে কোন ওলীকে শরীক করে নাই। কোন কবরের কাছে শির্ক করে নি। কোন পাথর বা মানুষকে তা’যীম করে নি। একারণেই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং গুনাহগারদের জন্য ক্ষমা কত নিকটে আর মুশরিকদের জন্য ক্ষমা কত দূরে!

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

কিছু লোক আছে যারা ভীত হয়, চিন্তিত-দুঃখিত হয়- যখন তারা দেখে সমাজের কিছু মানুষ সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, মদ্যপান... প্রভৃতি পাপাচরে লিপ্ত হয়। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না এমন লোকদের আধিক্য দেখে- যারা কবরের চৌকাঠ স্পর্শ করে বরকত চায়, সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করে, কবর-মাজারকে কেন্দ্র করে নানারকম ইবাদত বন্দেগী (শির্ক) করে, শির্কের চর্চা করে। অথচ ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি কাবীরা গুনাহ্; কিন্তু এর মাধ্যমে ব্যক্তি

ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যায় না। অন্যদিকে ইবাদতের সামান্যতম অংশ গাইরুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করার নাম হল শির্ক। যা নিয়ে মানুষ মৃত্যু বরণ করলে কাফের বা মুশরিক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। একারণে আলেমগণ আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয় সমূহের শিক্ষা দানকে মৌলিক বিষয় মনে করতেন এবং তার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন।

জনৈক শায়খ 'তাওহীদের গুরুত্ব' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং ছাত্রদের সামনে তা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। খুঁটি-নাটি মাসআলাগুলো বারবার আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকেন।

একদিন ছাত্ররা তাঁকে বলল, শায়খ! আমরা চাই বিষয় পরিবর্তন করে অন্যান্য বিষয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিন। যেমন- ইতিহাস, কিচ্ছা-কাহিনী, সীরাত... ইত্যাদি।

শায়খ বললেন, আল্লাহ্‌ চাহে তো এ ব্যাপারে আমি চিন্তা করব। পরদিন শায়খ ক্লাশে এলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুব চিন্তিত ও দুঃখিত। ছাত্ররা কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, শুনলাম পার্শ্ববর্তী গ্রামে জনৈক ব্যক্তি একটি নতুন ঘর তৈরী করেছে। কিন্তু বাড়ীতে জ্বিনের উপদ্রবের সে ভয় করছে। তাই জ্বিনকে খুশি করার জন্য নতুন ঘরের দরজার সামনে একটি মোরগ যবেহ্‌ করেছে। এখবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি একজন লোক পাঠিয়েছি। ঘটনাটি শুনে ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারা বলল লোকটিকে আল্লাহ্‌ হেদায়াত করুন। আর কোন কথা বলল না।

পরদিন শায়খ ক্লাশে এলেন। বললেন, গতকালের খবর যাচাই করে আমরা যা পেয়েছি তা সম্পূর্ণ উল্টা সংবাদ। উক্ত লোকটি জ্বিনের সন্তুষ্টির জন্য মোরগ যবেহ্‌ করেনি; বরং সে নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছে। একথা শুনে ছাত্ররা চিৎকার করে উঠল এবং লোকটিকে গালি-গালাজ করতে লাগল। তারা বলল, অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতে হবে, তাকে যথাযথ শাস্তি দিতে হবে, তাকে তওবা করাতে হবে। এনিয়ে তারা খুবই লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগল।

শায়খ বললেন, কি আশ্চর্যের বিষয়! একজন মানুষ একটি কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। আর তোমরা তার ব্যাপারে এত কঠোরভাবে প্রতিবাদ করছ; সে তো এর মাধ্যমে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় নি। আর তেমন কোন প্রতিবাদ তোমাদের যবান থেকে বের হচ্ছে না এমন ব্যক্তির বিরূদ্ধে যে কিনা আল্লাহ্‌র

সাথে শির্ক করেছে? আল্লাহ্‌র অধিকারে অংশী স্থাপন করেছে? গাইরুল্লাহ্‌র জন্য যবেহ্ করেছে? গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে?

একথা শুনে ছাত্ররা নিশ্চুপ হয়ে গেল। শায়খ তখন জনৈক ছাত্রকে আদেশ করলেন 'কিতাবুত্ তাওহীদ' নিয়ে এস, নতুনভাবে আবার তাওহীদের দরস শুরু হবে।

****

শির্ক হল সবচেয়ে বড় পাপ

আল্লাহ্ কখনই শির্ক ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।" (সূরা লোকমান- ১৩) মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম, তারা চিরকাল জাহান্নামের বাসিন্দা। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"নিশ্চয় যে আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করবে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাতকে হারাম করেছেন। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়েদাহ্- ৭২) যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হয়েছে, শির্ক তার যাবতীয় সৎ আমল [ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, দান-ছাদকা প্রভৃতি]কে ধ্বংস-বিনষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾

"আপনার কাছে ওহী করেছি এবং আপনার পূর্বে যারা এসেছিল তাদেরকেও ওহী করেছি এই মর্মে যে, তুমি যদি শির্ক কর, তবে অবশ্যই তোমার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। আর নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা যুমার- ৬৫)

****

শির্কের বিভিন্নরূপ

কিছু শির্ক আছে, যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বরে হয়ে কাফের হয়ে যায়। তওবা না করে উক্ত শির্ক নিয়ে সে যদি মৃত্যু বরণ করে, তবে চিরকাল জাহান্নামবাসী হবে। যেমন- গাইরুল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা। গাইরুল্লাহ্‌ তথা কবর-মাজারের ওলী বা কোন জ্বিনের নৈকট্য পাওয়ার জন্য পশু যবেহ্‌ করা, নযর-মানত করা। কোন মৃত পীর বা ওলী বা দরবেশ বা জ্বিন বা শয়তানকে এরূপ ভয় করা যে, সে কোন ক্ষতি করতে পারে বা রোগ-বালাই দিতে পারে। এমনিভাবে গাইরুল্লাহ্‌র কাছে এমন কিছু আশা করা যা দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নেই, যেমন- প্রয়োজন পূরণ, বিপদ থেকে উদ্ধার, সন্তান কামনা... যা আজকাল অধিকাংশ মাজার ও ওলীর দরবারে হয়ে থাকে।

কবর যিয়ারতের নাম করে মানুষ ঐসব মাজারে যায় এবং সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে শির্কে লিপ্ত হয়। অথচ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য তো হবে শুধু উপদেশ গ্রহণ এবং মৃতের জন্য দু'আ করা। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, (زُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ) "তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার, কেননা উহা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করাবে।" (মুসলিম)

কবর যিয়ারত শুধু পুরুষদের জন্য বৈধ। নারীদের কবর যিয়ারত শরীয়ত সিদ্ধ নয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক কবর যিয়ারতকারী নারীদের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। (তিরমিযী)

অপর পক্ষে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য যদি হয় কবরবাসীর কাছে দু'আ চাওয়া, তাদের কাছে উদ্ধার কামনা, প্রয়োজন পূরণ, তাদের উদ্দেশ্যে পশু বলী, তাদের বরকত লাভ, তাদের উদ্দেশ্যে নযর-মানত... তবে তা হবে সবচেয়ে বড় শির্ক। এ ক্ষেত্রে কবরবাসী নবী হোক বা ওলী বা কোন নেক ব্যক্তি কোন পার্থক্য নেই। কেননা তারা সবাই মানব জাতির অন্তর্গত। তারা কোন কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক নন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন, ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ "আপনি বলুন! আমি নিজ প্রাণের কোন কল্যাণ ও ক্ষতি করার মালিক নই।" (সূরা আ'রাফ- ১৮৮)

উল্লেখিত শির্কের অন্তর্গত আরো বিষয় হল, যা আজকাল কতিপয় অজ্ঞ লোক নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কবরের কাছে করে থাকে। যেমন- তাঁকে আহ্বান করে বা তাঁর কাছে দু'আ চায় বা তাঁর নিকট উদ্ধার কামনা করে...। অথবা যা ঘটে থাকে আবদুল কাদের জিলানী বা শাহজালাল বা শাহ্‌পরাণ... প্রমূখ ওলীদের কবরের কাছে, এ সবকিছু শির্কের অন্তর্গত।

আর কবরের কাছে ছালাত আদায় বা কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে তা যিয়ারত করতে যাওয়া একটি বিদআত। কেননা কবর ছালাত আদায় বা কুরআন তেলাওয়াতের স্থান নয়।

আশ্চর্যের বিষয় হল, অনেক মানুষ এমন আছে যারা মাজারে-কবরে যায়- সে ভাল করেই জানে যে কবরবাসী মৃত একটি লাশ যা মাটির সাথে মিশে গেছে। তারা যে অবস্থায় আছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা তাদের নিজেরই নেই- তারপরও মানুষ দু'আ কবূল হওয়ার জন্যে তাদের কাছে দরখাস্ত জানায়, বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করে। এ সমস্ত কবর বা মাজারের অধিকাংশকেই পাকা করা হয়েছে। সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে খাদেম ও পাহারাদার। এদেরকে দেখলে মনে হয় তারা কতবড় পরহেযগার ও আল্লাহ্ ওয়ালা। অথচ এরা ঐ সমস্ত মাজারের নামে কত রকমের মিথ্যাচার করে, আর মানুষকে শির্কের দিকে আহ্বান জানায়!

****

ওরা নারিকেল পুজা করে

যারা মৃতদেরকে আহ্বান করে তাদেরকে আমি বলি, তোমাদের এই মৃতরা.. যাদের দরজার কাছে তোমরা কান্নাকাটি কর এবং তাদের সুপারিশের আশা কর-

﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾

"ওরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়- যখন তোমরা তাদেরকে ডাক, বা তোমাদের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে?" (সূরা শুআরা- ৭৩) না, আল্লাহ্‌র শপথ! তারা কিছুই শোনে না, কোন উপকার করতে পারে না।

দেখুন না পাঠক ঐ ছোট বালকের কীর্তি কলাপ! তার বয়স ১৩। পিতার সাথে ভারত বেড়াতে গিয়েছে। ভারত একটি বড় দেশ। সেখানে নানারকম মা'বূদ আছে। ওরা সব কিছুর ইবাদত করে। পশু, বৃক্ষ, জড়বস্তু, মানুষ, নক্ষত্র কোন কিছুই বাদ পড়ে না।

বালক কোন একটি মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পেল লোকেরা নারিকেল পুজা করছে। নারিকেলে দু'টি চোখ, নাক ও মুখ আঁকা হয়েছে। ওরা তার পুজা করতে গিয়ে আগরবাতি জ্বালায়, খাদ্য-পানীয় তার সামনে পেশ করে। বালক দেখল, তারা নারিকেলের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করছে। যখন তারা সিজদা করেছে বালক তখন ফলটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। ওরা সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দেখে ওদের মা'বূদ (ভগবান) নেই! ডানে বামে নযর বুলিয়ে দেখলো একটি বালক তাদের মা'বূদকে নিয়ে পালাচ্ছে। তারা উপাসনা বন্ধ করে ছুটলো বালকের পিছে পিছে। এদিকে বালক কিছু দূর গিয়েই নারিকলেটিকে ভেঙ্গে ভিতরের পানি পান করে নারিকেলটি ফেলে দিয়েছে। তারা ভগবানের এ ভগ্ন দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল। বালকটিকে ধরে তারা আচ্ছামত প্রহার করে শহরের বিচারকের কাছে নিয়ে গেল।

বিচারক তাকে বলল: তুমি মা'বূদকে (ভগবানকে) ভেঙ্গেছো?

বালক: না, আমি একটি নারিকেল ভেঙ্গেছি।

বিচারক: কিন্তু এটা তো তাদের ভগবান (মা'বূদ)!

বালক: ওহে বিচারক! আপনি কি কোন দিন নারিকেল ভেঙ্গে খেয়েছেন?

বিচারক: হ্যাঁ।

বালক: তবে আপনার নারিকেল খাওয়া ও আমার নারিকেল ভাঙ্গার মধ্যে কি তফাৎ?

বিচারক চুপ হয়ে গেলন এবং পেরেশান হয়ে পড়লেন। অত:পর উপাসকদের দিকে তাকালেন, উদ্দেশ্য তারাই এর জবাব দিক। তারা বলল: এ নারিকেলের তো দু'টি চোখ, মুখ... আছে?

বালক একথা শুনে চিৎকার করে উঠল: এ কি কথা বলতে পারে? তারা বলল: না। বালক প্রশ্ন করল, সে কি শুনতে পায়? তারা বলল: না। বালক বলল: তাহলে কি যুক্তিতে তোমরা তার উপাসনা কর?

কাফেরের দল লাজওয়াব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

বিচারক দেখল, এরা হয়তো বালকের উপর চড়াও হয়ে তাকে কষ্ট দিতে পারে, তখন বালককে লক্ষ্য করে বলল, আমরা তোমার শাস্তি নির্ধারণ করেছি। ১৫০ রুপিয়া জরিমানা।

বালক বাধ্য হয়ে তা প্রদান করল; কিন্তু বিজয়ী বেশে কোর্ট থেকে বের হল।

****

কবর পূজারীদের অপরাধ আরো জঘণ্য রূপ ধারণ করে- যখন তারা মৃত ওলীদের তা'যীম বা তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের দু'আ চেয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং তারা উক্ত কবর সমূহের উপর ঘর বানাতে, তাকে উঁচু করতে এবং সুসজ্জিত করতে অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে।

কবরের উপর যে সমস্ত ঘর বা গম্বুজ তৈরী করা হয় তা দু'ভাগে বিভক্ত:

১) মুসলমানদের গোরস্থানে বিভিন্ন কবরের উপর আলাদাভাবে নির্মিত গম্বুজ সমূহ।

২) মসজিদ সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট গম্বুজ সমূহ। অথবা কবরের গম্বুজের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কখনো উক্ত গম্বুজ মসজিদের সামনের দিকে হয়, কখনো পিছনের দিকে, কখনো ডানে বা বামে। অথচ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ থেকে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) "হে আল্লাহ্! আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত করো না, মানুষ যার ইবাদত করে থাকে...।

আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন ঐ জাতিকে যারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে কেন্দ্র করে মসজিদ তৈরী করেছে।" (মুয়াত্বা মালেক, আহমাদ।) আবু হুরায়রা (রা:) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) "ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ্র লানত। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।"

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হায়্যায আল আসাদীকে বলেন, "আমি কি তোমাকে এমন আদেশ দিয়ে প্রেরণ করব না, যা দিয়ে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? (أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) কোন মূর্তী পেলেই তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। আর কোন কবর উঁচু পেলেই তা ভেঙ্গে মাটি বরাবর করে দিবে।" (মুসলিম)

এমনিভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন, কবর পাকা করতে, চুনকাম করতে, তার উপর বসতে, কবরে লিখতে। আর তিনি অভিশাপ করেছেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা কবরকে মসজিদ বানায় এবং সেখানে বাতি জালায়। (মুসলিম, তিরমিযি, আবূ দাউদ প্রভৃতি)

ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন (রা:)এর যুগে ইসলামী শহর সমূহে এরকম কোন শির্কী গর্হিত ঘটনা ঘটেনি- না নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরে না অন্য কারো কবরে।

দুঃখ জনক পরিস্থিতি

বর্তমান যুগের মানুষদের ঈমান-আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত দুঃখ জনক যে পরিস্থিতি তার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল।

মিছর: মিছরের শহর ও গ্রামে ওলীদের যে সমস্ত মাজার ও দরবার আছে তার সংখ্যা প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার)। এ সমস্ত স্থান হল, মুরীদ ও ভক্তদের জন্য উরূস উদ্‌যাপনের কেন্দ্রবিন্দু। সারা বছরের মধ্যে এমন কোন দিন খুঁজে পাওয়া কঠিন যখন মিছরের কোন না কোন স্থানে কোন না কোন ওলীর উরূস হচ্ছে না। বরং যদি এমন কোন গ্রাম পাওয়া যায় যেখানে কোন মাজার বা দরবার নেই, তবে মনে করা হয় সেখানকার গ্রামবাসী বরকত মুক্ত। এ সমস্ত দরবার বা মাজার দু'ভাগে বিভক্ত: কতগুলো ছোট কতগুলো বড়। বিল্ডিং এবং মাজারের প্রশস্থতা যত বেশী হয়, তার সুখ্যাতি তত বেশী প্রচার প্রসার হয়, মানুষ তার কথা বলেও বেশী, আর যিয়ারতের ভিড়ও হয় সেখানে অধিক।

মিছরের কায়রোতে যে সমস্ত বড় বড় মাজার ও দরবার রয়েছে, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, হুসাইনের মাজার, যাইনাবের মাজার, আয়েশার মাজার, সাকীনার মাজার, নাফীসার মাজার, ইমাম শাফেঈর মাজার, মুহাদ্দেছ লাইছ বিন সা'আদের মাজার।

তাছাড়া ত্বনত্বা এলাকায় বাদাভীর মাজার, দাসোক্ব এলাকায় দাসোকীর মাজার. হুমাইছারাহ্ গ্রামে শাযলীর মাজার...।

এ সমস্ত মাজারে নানারকম শির্ক ও বিদআতের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন- হুসাইনের মাজারে মানুষ হজ্জ করার উদ্দেশ্যে গমণ করে, নযর মানত এবং পশু যবেহ্ করার মাধ্যমে তার নৈকট্য কামনা করে। কখনো এর তওয়াফ করা হয়, রোগ মুক্তির প্রার্থনা জানানো হয়, প্রয়োজন পুরণের দরখাস্ত পেশ করা হয়...।

বাদাভীর মাজারে বছরে যে উরূস হয় তাতে প্রায় হজ্জের মতই লোকের সমাগম হয়। দেশের ভিতর-বাইরে থেকে শিয়া-সুন্নী সব ধরণের মানুষের সমাগম ঘটে। জালালুদ্দীন রূমী তার কবর ও মাজারের উপর যা লিখেছেন তা

ইসলাম, ইহুদী ও খৃষ্টান তিনটি ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বর্তমানে মুসলমানদের (?) এই মূর্তীকে বলা হয় 'মহান কুতুব'।

সিরিয়া: নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, সিরিয়ার দামেশক শহরেই শুধু ১৯৪টি মাজার রয়েছে। তম্মধ্যে ৪৪টি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বলা হয় এর মধ্যে ২৭টি কবর বিভিন্ন ছাহাবীদের। দামেশকেই একটি মাজার রয়েছে যা হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আ:)এর মাজার নামে পরিচিত। উহা মসজিদে উমুভীতে প্রতিষ্ঠিত। এ মসজিদের পার্শে ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী, ঈমাদুদ্দীন যানকী ও আরো অনেকের মাজার রয়েছে। মানুষ এ সমস্ত মাজার যিয়ারত করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে এবং এদের অসীলা করে প্রার্থনা করে।

তুর্কী: এ দেশে ৪৮১টির বেশী জামে মসজিদ আছে। এমন কোন জামে মসজিদ নেই যা মাজার থেকে মুক্ত। এগুলোর মধ্যে সুবিখ্যাত জামে মসজিদটি কুসতুনতুনিয়ায় (ইস্তাম্বুল) আবু আইয়্যুব আনছারীর (রা:)এর দিকে সম্বন্ধকৃত কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইরাক: শুধু মাত্র বাগদাদ শহরে ১৫০এর মত জামে মসজিদ রয়েছে। মাজার নেই এমন জামে মসজিদ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। 'মুছেল' শহরে ৭৬টি বিখ্যাত মাজার রয়েছে। প্রতিটিই জামে মসজিদ সংলগ্ন। সাধারণ মসজিদ সংশ্লিষ্ট মাজার এবং আলাদাভাবে মাজার যে এসব দেশের শহর-গ্রামগুলোতে কত রয়েছে তার সংখ্যা হিসাবের বাইরে...। (দেখুন: আল্ ইন্‌হিরাফাত আল্ আকাদীয়্যা পৃ: ২৮৯, ২৯৪, ২৯৫)

পাকিস্তান: এদেশের বড় মাজার গুলোর মধ্যে লাহোরের আলী হিজুরী, মুলতানের বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার মাজার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এসমস্ত মাজারে হরদম শির্কের মহড়া চলছে। অথচ প্রতিবাদী সোচ্চার কোন কণ্ঠ নেই।

ভারত: এদেশে কয়েক হাজার মাজার রয়েছে। তম্মধ্যে ১৫০টি অতি বিখ্যাত। লক্ষ লক্ষ মানুষের আনাগোনা হয়ে থাকে এসব মাজারে। এবং নানাভাবে আল্লাহর অধিকার সমূহ এখানে পদদলিত হয়। বিশেষ করে আজমীরের খাজা মাইনুদ্দীন চিশতীর মাজার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। [১]

---

[১] . বাংলাদেশেও মাজারের সংখ্যা কয়েক হাজার। সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার সিলেটের শাহজালালের মাজার সুবিখ্যাত। যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বা বিপদাপদের সম্মুখিন হলেই হাজার হাজার মানুষ ছুটে যায় এসমস্ত মাজারে এবং নযর মান্নতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে। নির্বাচনে জেতার জন্য আমাদের নেতা-নেতৃরাও তাদের

আশ্চর্যের কথা যে, এ ধরণের মাজার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যা মাজার হয়ে থাকে, যার বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

* হুসাইন (রা:)এর কবর মিছরের কায়রোতে দাবী করা হয়। মানুষ তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সেখানে গমণ করে, নানারকম ইবাদত সেখানে করা হয়। যেমন, তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া, সেখানে পশু যবেহ্ করা, এমনকি তওয়াফও চলে।

অথচ দাবী করা হয় যে, ফিলিস্তিনের 'আসক্বালান' শহরেও হুসাইনের কবর রয়েছে।

সিরিয়ার হালাবের পশ্চিমে জোশান পাহাড়ের চুঁড়ায় একটি মাজার আছে। বলা হয় এখানে হুসাইন (রা:) এর মাথা রয়েছে।

আরো চার স্থানে হুসাইন (রা:) এর মাথার সমাধি রয়েছে বলে দাবী করা হয়: ১) দামেশক ২) হানানা [ইরাকের নজফ এবং কূফার মধ্যবর্তী একটি স্থান] ৩) মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর মাতা ফাতিমার (রা:) কবরের সাথে। ৪) ইরাকের নজফ এলাকায় একটি কবরের কাছে যা তাঁর পিতা আলী (রা:) এর কবর বলে উল্লেখ করা হয়।

আরো দাবী করা হয় যে, ইরাকের কারবালায় হুসাইনের (রা:) কবর রয়েছে। এখানে তাঁর মাথা ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেহের সাথে দাফন করা হয়। এসমস্ত স্থানের কবরগুলোর অধিকাংশের মধ্যে অনুরূপ শির্ক ঘটে থাকে।

* যায়নাব বিনতে আলী (রা:) মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে বাক্বী গোরস্থানে দাফন করা হয়। অথচ শিআরা তার নামে দামেশকে একটি কবর তৈরী করেছে।

প্রচারাভিযান শুরু করেন এসমস্ত মাজারের বরকত (?) নিয়ে। মজার ব্যাপার হল, মানুষ মাজারের ওলীর অসীলা করেই ক্ষ্যান্ত হয় না বরং মাজার সংলগ্ন জীবজন্তুরও পূজা শুরু করে দেয়। যেমন বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারে কচ্ছপ পূজা করে, শাহজালালের মাজারে গজার মাছের পূজা করে। (হায় হতভাগ্য মুসলিম জাতি! হায় বিবেকহীন তাওহীদী জনতা!!?)

এর চাইতে দুঃখের কথা হল, শাহাজালাল (র:) এর মাজার- যেখানে চব্বিশ ঘন্টা শির্কের চর্চা হয়- তার এরিয়ার মধ্যে একটি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে দওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়। সে মাদ্রাসার ব্যয়ভার পরিচালনা করা হয় মাজারের ইনকাম থেকে!? কি আশ্চর্য শিক্ষা ব্যবস্থা! শির্ক থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দান?

এমনিভাবে কায়রোতেও তার মাজারের দাবী করা হয়। অথচ ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি (যায়নাব) জীবিত বা মৃত কখনো মিছর গিয়েছেন!

* মিছরের ইসকান্দারীয়ার অধিবাসীগণ দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করে যে, আবূ দারদা (রা:) তাদের শহরে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত মাজারের মধ্যে সমাধিস্থ রয়েছেন। অথচ বিজ্ঞজনরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, উক্ত শহরে তাঁকে কবর দেয়া হয়নি।

* এরূপই কথা হল রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর মেয়ে রুকাইয়া (রা:) এর কবর সম্পর্কে। যে ব্যাপারে দাবী করা হয়, এটি মিছরের কয়রোতে রযেছে। উক্ত নামে কায়রোতে এ মাজারটি প্রতিষ্ঠা করে ফাতেমী খলীফা ‘আমের বি আহকামিল্লাহ্’র স্ত্রী। অনুরূপ কথা হল সাকীনা বিনতে হুসাইন বিন আলী (রা:) এর মাজার সম্পর্কে।

* আর একটি সুপরিচিত মাজার হল, ইরাকের নাজাফ এলাকায় হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা:) এর দিকে সম্বন্ধকৃত মাজার। এটি একটি মিথ্যা কবর। কেননা তিনি তৎকালীন রাজধানী কূফার রাজকীয় মহলে সমাধিস্থ হন।

* ইরাকের বছরায় ছাহাবী আবদুর রহমান বিন আউফের (রা:) নামে একটি কবর রয়েছে। অথচ নিশ্চিত কথা হল, তিনি মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন এবং বাক্বী গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

* সিরিয়ার হালাবে ছাহাবী জাবের বিন আবদুল্লাহ্র (রা:) নামে একটি মাজার রয়েছে। অথচ তিনি মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন।

* বরং সিরিয়ায় অবস্থিত দু‘টি মাজার সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে, এ দু‘টি কবর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর দু‘মেয়ে উম্মু কুলছুম এবং রুকাইয়ার (রা:)। অথচ এঁরা দুজনই হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রা:)এর স্ত্রী ছিলেন। আর তাঁরা রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশাতে মদীনাতেই মৃত্যু বরণ করেন এবং বাক্বী গোরস্থানে তাঁদেরকে দাফন করা হয়।

* বিজ্ঞজনদের ঐক্যমতে আরো মিথ্যা কবরের অন্তর্গত হল, হুদ (আ:) এর নামে সম্বন্ধকৃত কবরটি। যা দামেশকের জামে মসজিদে রয়েছে। কেননা হুদ (আ:) কখনো শাম বা সিরিয়ায় গমণ করেননি। এমনিভাবে হুদ (আ:) এর নামে ইয়ামানের হাযরামাওত এলাকায়ও একটি কবর উল্লেখ করা হয়!

হাযরামওত: ইয়ামানের হাযরামওত এলাকায় একটি মাজার আছে। মানুষের ধারণা কবরটি হযরত ছালেহ্ (আ:) এর। অথচ তিনি হিজাযে মৃত্যু বরণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর নামে ফিলিস্তিনের ইয়াফা এলাকায়ও একটি মাজার রয়েছে! ওখানে (ইয়াফাতে) আইয়্যুব (আ:) এর মাজারও দাবী করা হয়।

চিন্তার বিষয় যে, পেট পূজার জন্য মানুষকে কতবড় ধোকায় ফেলা হয়েছে। ওলী এবং বুযুর্গদের নিয়ে রিতিমত ব্যবসা করা হচ্ছে। মিথ্যা এবং ধোকার ভিত্তির উপর শির্ক ও বিদআতের বিশাল বিশাল ইমারত তৈরী করা হয়েছে।

***

শাইখ বরকতের কারামতী: (মিথ্যা পীরের সত্য কাহিনী)

দেখুন! মানুষের বিবেক নিয়ে শয়তান কিভাবে খেলা করে। এমনকি আসমান-যমীনের স্রষ্টার ইবাদত থেকে মানুষের ইবাদত, মৃতের তা'যীম.. বরং প্রাণী এবং জড়বস্তুর তা'যীমের দিকে আহ্বান করে।

কখনো একটি মিথ্যা কবর প্রতিষ্ঠা করে তার প্রচার করা হয়। মানুষের কাছে তার কারামতের কথা নানাভাবে উল্লেখ করা হয়। যাতে করে এ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা লাভবান হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মানুষ তা বাস্তব মনে করে। অত:পর শুরু হয় শির্কের খেলা। তওয়াফ হয়, দু'আ চাওয়া হয়, নযর-মানত হয়... অন্যান্য কবরে যা হয় এখানেও তাই। চাই উক্ত কবর যার নামে প্রচার করা হয় তা সত্য হোক বা মিথ্যা।

জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে শায়খ বরকতের এরকমই একটি কিচ্ছা উল্লেখ করেছে। ঘটনাটির সূচনা হয় দু'জন যুবকের দ্বারা। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আদেল ও সাঈদ। পড়াশোনা শেষ করে একটি গ্রামে তারা স্কুলের শিক্ষকতা কর্মে নিয়োজিত। গ্রামটিতে কবর ও মাজার খুব বেশী। মানুষ ওগুলোর তা'যীম করে, নাযর-নিয়ায পেশ করে, উরূস করে...।

স্কুলে যেতে হয় বাসে চড়ে। একদিন বাসের উপর আদেল ও সাঈদ পারস্পরিক কথাবার্তায় লিপ্ত। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ বাসে উঠে ভিক্ষা চাইতে লাগল। গায়ে তার হাজার তালির পোষাক। তাও ময়লা মাখা। বয়সের ভারে

কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছে অর্ধ পাগল, মুখের লালা বারবার মুছে ফেলছে হাতের আস্তিনে। গাড়িতে চড়ে সে যাত্রীদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করছে, তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, দাবী করছে তার দু'আ সর্বদায় কবূল হয়ে থাকে, সে যদি বদ দু'আ করে তবে বাস উল্টে যেতে পারে...।

সাঈদ এমন পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছে যারা ওলী-আউলিয়া, তথা কথিত পীর-ফকীর, দরবেশ, কুতুব, আবদাল... দ্বারা প্রভাবিত। সে ভীত ও পেরেশান হয়ে সাথী আদেলকে অনুরোধ জানায় ভাই কিছু দিয়ে দাও। কেননা এ দরবেশ খুব বরকতময় লোক। সর্বদা তার দু'আ কবূল হয়। হতে পারে বাস্তবিকই তার বদ দু'আয় বাস উল্টে যাবে।

আদেল তার কথায় খুবই আশ্চর্য হল। বলল, হ্যাঁ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা কারামতে বিশ্বাস করে; কিন্তু নেককার ও পরহেযগার লোকদের কারামত। যারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার্থে গোপনে সৎআমল করে। এ সমস্ত ভন্ড ও ভবঘুরে লোকদের কারামত নয়। যারা নিজেদের দ্বীন বেচে অর্থ উপার্জন করে।

সাঈদ চিৎকার করে উঠল। কি তুমি আজেবাজে কথা বলছ! এই দরবেশের কারামতের কথা ছোট-বড় সব লোকেরই জানা! একটু পরেই দেখবে তিনি এখন বাস থেকে নেমে যাবেন। আর আমরা গ্রামে পৌঁছার আগেই তিনি হেঁটেই আমাদের আগে পৌঁছে যাবেন। এটা তাঁর কারামাত। তুমি কি ওলীদের কারামাতকে অস্বীকার কর?

আদেল: আমি কখনই কারামাতের অস্বীকার করি না। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করতে পারেন। কিন্তু এটা হতে পারে না যে, এই কারামতের দরজা দিয়ে আমাদের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করবে- আমরা এ সমস্ত মানুষকে, মৃত ওলীদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার মনে করব? সৃষ্টি, নির্দেশ, জগতের পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষমতা আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন এ বিশ্বাস করব? আর তাদেরকে আমরা ভয় করব, তাদের ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব? এটা সম্ভব নয়।

সাঈদ: তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, শায়খ 'আহমাদ আবূ সারুদ' হজ্জে এসে আরাফাতের দিন (তুরস্কের) ইস্তাম্বুল গিয়ে নিজ পরিবারের সাথে খাদ্য খেয়ে আবার আরাফাতে ফিরে এসেছেন?

আদেল: সাঈদ! আল্লাহ্ তোমার বিবেকে বরকত দিন! তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে একথাই শিখেছো?

সাঈদ: মনে হয় আমরা হাঁসি-ঠাট্টা শুরু করেছি।

আদেল: আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবান্তর কথা আর তাদের কুসংস্কারের কোন প্রতিবাদ করা যাবে না এমন তো নয়।

সাঈদ: কিন্তু এ সমস্ত কারামাতের কথা শুধু সাধারণ মানুষের মুখেই শোনা যায় না; বড় বড় আলেম ওলামাগণও এ সমস্ত মাজার ও দরবারের অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে থাকেন! বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে এসমস্ত বিষয় ব্যাপকহারে আলোচনা হয়।

আদেল: ঠিক আছে সাঈদ, তোমার কি মত আমি যদি বাস্তবে প্রমাণ করে দিতে পারি যে, এসমস্ত মাজার ও দরবারের অধিকাংশই মিথ্যা ও কাল্পনিক? এ সব মাজারের অধিকাংশের হাক্বীকত নেই- কবর নেই, লাশ নেই, কোন ওলী নেই। কিছু মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের কারণে মানুষের কাছে তা সত্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একথা শুনে সাঈদ ক্রোধে ফুঁসে উঠল এবং বলতে লাগল, আঊযুবিল্লাহ্! আঊযুবিল্লাহ্!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকল। বাস তাদেরকে নিয়ে গ্রামে প্রবেশের আগে চৌরাস্তার মোড়ে যখন পৌঁছল তখন আদেল সাঈদকে লক্ষ্য করে বলল, সাঈদ! রাস্তার এ মোড়ে কি কোন ওলীর কবর বা দরবার বা মাজার আছে?

সাঈদ: না, এটা কোন যুক্তি সংগত কথা হল না কি- একজন ওলীকে চৌরাস্তায় বা রাস্তার মোড়ে দাফন করা হবে?

আদেল: তাহলে তোমার কি মত, যদি আমরা গ্রামে প্রচার করে দেই যে, এই চৌরাস্তায় জনৈক নেক ব্যক্তির পুরাতন কবর আছে, যার চিহ্ন আজ মিটে গেছে এবং নষ্ট হয়ে গেছে? এরপর আমরা তার কারামতির কিছু ঘটনা, তার কাছে দু'আ কবূল হওয়ার কিছু গল্প মানুষের সামনে পেশ করব। দেখি মানুষ বিশ্বাস করে কি না? আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি মানুষ ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে; বরং হতে পারে পরবর্তী বছর তারা এখানে একটি বিরাট মাজার বা দরবার প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। এরপর শুরু হবে সেখানে শির্ক। অথচ এখানে শুধু মাটিই মাটি- যদি ওরা যমীনের পাতাল পর্যন্ত খনন করে তো কিছুই পাবে না।

সাঈদ: কি সব আজেবাজে কথা বলছ? তুমি কি মনে করেছো মানুষ এতই বোকা ও নির্বোধ?

আদেল: ঠিক আছে, তুমি যদি আমাকে এব্যাপারে সহযোগিতা কর এবং মত দাও তাতে তো তোমার কোন ক্ষতি নেই? নাকি তুমি ফলাফলের ব্যাপারে আশংকা করছ?

সাঈদ: না, ভয় করি না। তবে বিষয়টিতে আমি তেমন সন্তুষ্ট নই।

আদেল: বুঝা গেল তোমার মত আছে। তুমি কি মনে কর যদি আমরা যদি প্রস্ত াবিত ওলীর নাম রাখি 'শায়খ বরকত'?

সাঈদ: ঠিক আছে, তুমি যা চাও।

এরপর দু'বন্ধু বিষয়টি খুব ধীরে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিল। এক্ষেত্রে তারা প্রথমে চায়ের স্টল সেলুন প্রভৃতি দোকান থেকে শুরু করবে। কেননা এসব স্থান থেকেই যে কোন সংবাদ দ্রুত প্রসার হয়। তারা গ্রামে পৌঁছে সলিমের সেলুনে গেল। তার সামনে ওলী-আউলিয়াদের কথা আলোচনা করার পর বলল, জনৈক নেক ওলী অনেক বছর থেকে সমাধিস্থ আছেন। অথচ আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর মর্যাদা অনেক বেশী; কিন্তু তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার লোকের সংখ্যা খুব কম।

সেলুনের নাপিত জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে কবরটি? তারা বলল, গ্রামে প্রবেশের আগে যে চৌরাস্তা রয়েছে তার মোড়ে!

নাপিত: আল্ হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্‌র সব তা'রীফ, তিনি আমাদের গ্রামে একজন ওলী দিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমি বহুকাল থেকে এরকম একটা আশা করছিলাম। এটা কি কোন যুক্তি সঙ্গত কথা হতে পারে- পার্শবর্তী 'নতুন গ্রামে' 'নারায়নপুর' গ্রামে দশ জনের বেশী ওলী-আওলিয়া আছেন- আর আমাদের গ্রামে একজনও থাকবে না?

আদেল: সলিম ভাই! 'শায়খ বরকত' খুব বড় মাপের ওলী ছিলেন। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর খুব মান-মর্যাদা ছিল।

নাপিত চিৎকার করে উঠল: শায়খ বরকত (ক্বাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) সম্পর্কে আপনি এত কিছু জানেন, তারপরও চুপ রয়েছেন?

এরপর শায়খ বরকতের খবর শুষ্ক ঘাসে আগুন দেয়ার মত গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মুখে মুখে সে কথা আলোচনা হতে লাগল। এমনকি মানুষ স্বপ্নেও তা দেখতে লাগল।

বিভিন্ন চায়ের দোকানে, মজলিসে, বাজারে, মসজিদে..'শায়খ বরকতের' নানান বরকতের কথা, তার মাথার চুল কত দীর্ঘ ছিল, পাগড়ী কত লম্বা ছিল, অসংখ্য-অগণতি কারামতির কথা- আযানের সময় হওয়ার সাথে সাথে মিনার নীচে নেমে আসত... ইত্যাদি.. ইত্যাদি।

স্কুলের শিক্ষকদের মাঝেও বিষয়টি বাদ-প্রতিবাদের সাথে আলোচিত হতে লাগল। যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন শিক্ষক সাঈদ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চিৎকার করে উঠল, ওহে বিবেকবানের দল! আপনারা ছাড়ুন এ সমস্ত কুসংস্কার ও অমুলক বিশ্বাসের কথা! শিক্ষকগণ সমস্বরে বলে উঠল, কুসংস্কার.. তুমি বলতে চাও এখানে শায়খ বরকত নেই?

সাঈদ: অবশ্যই নেই। এধরণের কোন কবর এখানে নেই। এটি একটি অপপ্রচার। চৌরাস্তার মোড়ে শুধু মাটি আর মাটি। না কোন শায়খ বা ওলী বা দরবার ছিল বা না আদৌ আছে।

শিক্ষকগণ যেন কেঁপে উঠলেন। একযোগে বললেন, কি বল তুমি? 'শায়খ বরকত' সম্পর্কে এমন কথা বলার স্পর্ধা তোমার হল কিভাবে? 'শায়খ বরকতের' বরকতে গ্রামের পশ্চিমের নদীটি ভরাট হয়েছে। তিনিই ...।

তাদের চেঁচামেচীতে সাঈদ পেরেশান হয়ে উঠল। তারপরও সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা নিজের বিবেক বিক্রয় করে দিবেন না। আপনারা শিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ। কোন কবর বা মাজার সম্পর্কে একজন এসে কিছু বলল বা স্বপ্নে শয়তান কিছু দেখালো আর তাই বিশ্বাস করে নিবেন?

এতক্ষণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীরব ছিলেন। তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন, 'শায়খ বরকতের' গুণাগণ আছে এবং তা নিশ্চিত। তুমি কি গতকালের পত্রিকা পড়নি?

সাঈদ: আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, পত্রিকাতেও! কি লিখা হয়েছে তাতে?

প্রধান শিক্ষক: পত্রিকা বের করে সকলের সামনে পাঠ করছেন। পত্রিকার সবচেয়ে বড় শিরনাম হচ্ছে (اكتشاف مقام الشيخ بركات) 'শায়খ বরকতের দরবার আবিস্কার'। লিখা হয়েছে: "শায়খ বরকত (দামাত বারাকাতুহু) ১১০০

হি: সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের (রা:) ৩৩তম অধঃস্তন সন্তান। অনেক উলামায়ে কেরামের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন উমুক.. উমুক.. উমুক..। তিনি তুর্কী সৈন্য বাহিনীর সাথে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। যুদ্ধ যখন ভীষণ আকার ধারণ করে, তিনি খৃষ্টান বাহিনী লক্ষ্য করে একটি ফুঁ মারেন। সাথে সাথে ঘূর্ণিঝড় খৃষ্টান বাহিনীর উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। ঝড় তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে একশ মিটার দূরে নিক্ষেপ করে। সবাই আর্তচিৎকার করতে করতে রক্তাক্ত অবস্থায় ধুলায় লুটিয়ে পড়ে...।

সাঈদ: মাশাআল্লাহ্! শায়খ বারাকাত সম্পর্কে সাংবাদিক সাহেব এত সুক্ষ্ম বিবরণ পেলেন কোথায়?

প্রধান শিক্ষক: এগুলো সত্য কথা। তুমি কি মনে কর এসব কথা তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে? এগুলো ইতিহাস..।

সাঈদ: কিন্তু এসব দাবীর পক্ষে দলীল থাকা জরুরী। যে কোন দাবী এলেই তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা আপনার উপর আবশ্যক। অন্যথা যে কেহ যা ইচ্ছা দাবী করতে পারে.. কবর.. ওলী-আউলিয়া, কারামাত...।

তারপর সাঈদ চিৎকার করে উঠল। আপনারা আমার সুস্পষ্ট কথা শুনুন, শায়খ বরকত নামের এ দরবার বা মাজার একটি মিথ্যা ও অপপ্রচার মাত্র। আমি এবং স্যার আদেল মিলে এটি উদ্ভাবন করেছি। প্রকৃতপক্ষে এখানে কিছুই নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হল, মানুষের মূর্খতা এবং ভ্রষ্টতা যাচাই করে দেখা। স্যার আদেল আপনাদের সামনে আছেন তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন!

শিক্ষকগণ আদেলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, এলোকও তো তোমার মত বিতর্ক পসন্দ করে। সব বিষয়ে দলীল চায়। সে তো ওলী-আউলিয়ার দুশমন।

তুমি আর আদেল যা-ই বল না কেন- আমরা বিশ্বাস করি শায়খ বরকত (দামাত বারাকাতুহু) যুগ যুগ ধরে এখানে রয়েছেন। দুনিয়ার কোন স্থান ওলী-আউলিয়া, পীর-দরবেশ, গাউছ-কুতুব থেকে খালি নয়। তোমার বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় কামনা করি।

সাঈদ ও আদেল নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ক্লাশের বেল বেজে উঠল। সবাই নিজ নিজ শ্রেণী কক্ষে চলে গেলেন।

ওস্তাদ সাঈদ যা দেখছেন এবং শুনছেন তাতে অস্থির হয়ে উঠলেন। চিন্তা করছেন শায়খ বরকত.. কারামতী.. সম্ভব.. অসম্ভব? এটা কি সম্ভব এত লোক সবাই ভুলের মধ্যে রয়েছে? পত্রিকার রিপোর্ট মিথ্যা?

আশ্চর্যের বিষয়, এলাকার বুযুর্গ, আলেম-ওলামাগণ তো কিছু দিন আগে চৌরাস্তার মোড়ে শায়খ বরকতের নামে উরূস মোবারকও উদযাপন করলেন? কিন্তু শায়খ বরকত তো ওস্তাদ আদেলের পক্ষ থেকে বানোয়াট একটি নাম.. কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে, এত লোক সবাই প্রলাপ বকছে? অসম্ভব.. অসম্ভব.. ।

ধীরে ধীরে সাঈদের মগজে নতুন চিন্তা প্রবেশ করতে লাগল। হয়তো শায়খ বরকত আছেনই। ওস্তাদ আদেল হয়তো আগে থেকেই ব্যাপারটা জানতেন। কিন্তু মানুষকে সন্দেহে ফেলার জন্য এখন হয়তো বলছেন, আমি নিজে 'শায়খ বরকত' নামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছি।

সাঈদ স্যার বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তা-গবেষণা করলেন। এ থেকে বের হওয়ার জন্য শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। তার মগজে বিষয়টি যেন ভালভাবেই স্থান পেয়েছে।

পরবর্তী দিন.. পরের দিন.. বিষয়টি নিয়ে স্কুলে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকল। তখন ছিল শিক্ষা বর্ষের শেষের দিক। বাৎসরিক ছুটি হল। শিক্ষকগণ নিজ নিজ এলাকায় ছুটি কাটাতে চলে গেলেন।

নতুন শিক্ষা বর্ষ শুরু হল। শিক্ষকগণ দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে এসেছেন। আদেল ও সাঈদ আগের মত বাসে চড়ে গ্রামের স্কুলে যাচ্ছেন। আদেল স্যার 'শায়খ বরকতের' বিষয়টি বেমালুম ভুলেই গিয়েছেন। অথচ তিনিই এ ঘটনার জন্মদাতা। কিন্তু বাস যখন গ্রামের প্রবেশ পথে সেই চৌরাস্তায় পৌঁছেছে, তখন আদেল লক্ষ্য করলেন, স্যার সাঈদ যেন গুণগুণ করে কি কি দু'আ যিকির পাঠ করছেন।

ওদিকে স্যার আদেল বিস্ময়ে হা হয়ে গেলেন। তিনি একি দেখছেন? চৌরাস্তার মোড়ে কত সুন্দর মাজার বানানো হয়েছে। মাজারের উপর আকাশচুম্বী বিশাল গম্বুজ ঝলমল করছে। পাশে তুর্কী স্টাইলে বানানো সুবিশাল মসজিদ।

আদেল মুচকি হেঁসে মনে মনে বলল মানুষ কত নির্বোধ! শয়তান তাদেরকে শির্কে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে কতই না কামিয়াব হয়েছে! তিনি স্যার সাঈদকে হাঁসিতে শরীক করার উদ্দেশ্যে তার দিকে নযর দিলেন, কিন্তু একি তিনি তো দু'আর জগতে ডুবে আছেন..। এক সময় তিনি চিৎকার করে বাস চালককে অনুরোধ করছেন, এখানে একটু থাম। তারপর তিনি দু'হাত উঠিয়ে শায়খ বরকতের রূহের উপর ফাতিহাখানি পাঠ করলেন...। (লন্ডন থেকে প্রকাতি মাসিক আল বায়ান (আরবী) পত্রিকা)

****

ওরা সেখানে কি করে?

কবর-মাজারের ভক্তরা যখন সে সকল স্থানে গমণ করে, তারা সাথে নিয়ে যায় গরু, ছাগল, মুরগি, ডিমসহ নানারকম খাদ্য সামগ্রী ও অর্থকড়ি। উদ্দেশ্য এগুলো মাজারের অধিবাসীর নৈকট্য হাসিলের জন্য পেশ করা। কখনো তারা মাজারের ওলী বা পীরের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবেহ্ করে, তাদের কবর তওয়াফ করে, কবরের মাটি নিয়ে মুখে মাথায় মাখে, প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানায়..।

এ সমস্ত কবর পূজারীদের অনেকে এমনও আছে যারা এ সমস্ত পীর বযুর্গের নামে মৃত ওলীর নামে কসম করে। কেউ যদি কোন বিষয়ে তাদের সামনে মহান আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তবে তা তারা গ্রহণ করে না এবং বিশ্বাসও করে না। যখন ওলী বা পীরের নামে শপথ করে তখন তা গ্রহণ করে ও বিশ্বাস করে।

এদের স্পর্ধা এমনও হয়েছে যে তারা কবরের হজ্জ আদায়ের জন্য নতুন শরীয়ত প্রনয়ণ করেছে। যেমন কবরের তওয়াফ, মানত করার পদ্ধতি, যিয়ারত ও দু'আ চাওয়ার নিয়ম, কোন কোন কাজ করলে মাজারস্থিত পীরের সাথে বেয়াদবী হবে। কতবার যিয়ারতে আসলে এক হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যাবে... ইত্যাদি। এমনকি তাদের কট্টরপন্থীরা কবরকে বায়তুল্লাহিল হারাম কা'বা শরীফের সাথে সাদৃশ্য করে এক্ষেত্রে কিতাবও রচনা করেছে। কিতাবের নাম রেখেছে 'মাজারের হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি'। (নাঊযুবিল্লাহ্)

মাজার যিয়ারতের আদব!: শির্ক ও বিদআতের ক্ষেত্রে তাদের বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মাজার যিয়ারত কারীদের জন্য আদব ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন:

১) ওলী বা পীরের সম্মানার্থে তার মাজার যিয়ারতকারী জুতা খুলে বাইরে রেখে মাজারে প্রবেশ করবে।

২) ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে পাহারাদার বা খাদেমের অনুমতি নিতে হবে। কখনো কা'বা ঘরের তওয়াফ করার মত করে মাজারের যিয়ারত বা তওয়াফ করানোর জন্য সেখানে খাদেম নিযুক্ত থাকে।

৩) যিয়ারত শেষে বের হওয়ার সময় উল্টা পিঠে বের হতে হবে। মাজারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বের হওয়া যাবে না। কারণ তাতে ওলীর অসম্মান করা হয়।

যিয়ারতকারী মাজার ও গম্বুজের বরকত লাভের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালায়: যেমন মাজারের মাটি চোখে-মুখে লাগায়, বয়ামে ভরে ঘরে নিয়ে যায়, মাজারের দেয়াল গ্রিল প্রভৃতি হাত দিয়ে স্পর্শ করে সে হাত চোখে মুখে সমস্ত শরীরে ও কাপড়ে বুলায়। যে কোন মাজারে আপনি চলে যান দেখবেন কিভাবে আল্লাহ্‌র অধিকার পদদলিত হচ্ছে- গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত হচ্ছে। সমাধিস্থ ব্যক্তির কাছে দু'আ করছে দু'আ চাচ্ছে তার সাহায্য কামনা করছে দু'আয় অনুনয় বিনয় করছে...। অনেক মহিলা নিজের বাচ্চাকে তাকে উপরে উঠিয়ে মাজারের ওলীর বরকত চাইছে। অনেকে কবরকে সিজদা পর্যন্ত করছে। নযর-মানত পেশ করছে। কেউ কেউ এ সমস্ত মাজারে সপ্তাহ বা মাস ধরে ই'তেকাফ করছে- রোগ মুক্তি বা প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে। ভোটে জেতার জন্য অনেক নেতা-নেত্রী মাজারে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্যে কোন কোন মাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট করে যিয়ারতকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বিশ্রামাগার।

যেমনটি আপনি দেখতে পাবেন যিয়ারতকারীর মধ্যে কি রকম বিনয় ও প্রশান্তি বিরাজ করছে। এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংখায় দু'চোখ অশ্রু প্লাবিত হচ্ছে।

মাজারস্থ এসমস্ত ব্যক্তিগণ যেন এ দুনিয়ার মা'বূদ। এরাই মানুষের ত্রাণকর্তা..। অথচ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারো ইবাদত চাই সে নবী হোক বা ফেরেস্তা.. আল্লাহ্ না তার অনুমতি দিয়েছেন না তিনি এতে সন্তুষ্ট। কেননা তা সুস্পষ্ট শির্ক।

ওদের হৃদয় নষ্ট

এ সমস্ত কবর বা মাজারের অধিবাসীগণ অন্যের উপকার তো দূরের কথা নিজেদের সাহায্য বা উপকার করারই কোন ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু এদের দরবারে যারা ধর্ণা দেয় তাদের হৃদয়ে তাদের প্রতি সম্মান ও ভয়-ভীতি বিরাজমান। তাদের শানের খেলাপ বা বেয়াদবী মূলক কোন কথা মুখে উচ্চারণ করাও বিপদের কারণ মনে করে।

তাদের অবস্থা আর জাহেলী যুগের ছাক্বীফ গোত্রের লোকদের অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাদের মূর্তীকে ভয় করছিল- যদিও উক্ত মূর্তীর মধ্যে উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতা ছিল না।

ঐতিহাসিক মূসা বিন উক্ববা (রহ:) উল্লেখ করেন। ইসলাম যখন মানুষের মাঝে বিজয় লাভ করল। তখন বিভিন্ন ক্ববীলা থেকে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আগমণ করল। ছাক্বীফ গোত্রের দশোর্ধ লোক নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আগমণ করল, তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে বসার নির্দেশ দিলেন যাতে করে তারা কুরআন শুনতে পায়।

যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকিয়ে যে মূর্তীর উপাসনা করত তার কথা স্মরণ করল। মূর্তীটির নাম ছিল 'রাব্বাহ্'। তারা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে সুদ, ব্যভিচার, মদ্যপান .. প্রভৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি এগুলো হারাম ঘোষণা করলেন। তারা তা মেনে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল 'রাব্বাহ্' সম্পর্কে, তার কি হবে? তিনি বললেন, ওটা ভেঙ্গে ফেল। তারা বলল, অসম্ভব! 'রাব্বাহ্' যদি জানে যে আপনি তা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছেন, তবে সে গ্রামবাসী এবং আশেপাশের সবাইকে মেরে ফেলবে। তখন ওমর বিন খাত্তাব (রা:) বললেন, তোমরা ধ্বংস হও! কত মূর্খ তোমরা! রাব্বাহ্ তো একটি পাথর। তারা বলল, আমরা আপনার কাছে আসি নাই হে খাত্তাবের ছেলে। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওটা ভাঙ্গার দায়িত্ব আপনিই গ্রহণ করুন। আমরা কখনই তা ভাঙ্গতে পারব না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে আমি এমন কাউকে পাঠাব যে তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য যথেষ্ট হবে। ওরা অনুমতি নিয়ে কওমের মাঝে ফিরে গেল। মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিল। সবাই মুসলমান হয়ে গেল। কিছু দিন তারা সেভাবেই রইল। কিন্তু মূর্তীর ভয় তাদের অন্তরে রয়েই গেল। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে একদল ছাহাবী প্রেরণ করলেন। তাদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুগীরা বিন শো'বা (রা:) ছিলেন। ছাহাবীগণ মূর্তী ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আর তা দেখার জন্য ক্বীলার নারী-পুরুষ শিশু সবাইকে একত্রিত করা হল। সবাই তারা ভয়ে কাঁপছে। তাদের বিশ্বাস এ মূর্তী কেউ কখনো ভাঙ্গতে পারবে না। যে-ই তাকে অন্যায় স্পর্শ করবে তার মৃত্যু হবে।

মুগীরা বিন শো'বা (রা:) অগ্রসর হলেন। হাতে কুড়াল। তিনি সাথীদের বললেন, আমি ছক্বীফের লোকদের নিয়ে তোমাদেরকে একটু হাঁসাবো। তারপর তিনি কুড়াল দিয়ে মূর্তীর উপর একটি আঘাত করে পা খুঁড়িয়ে পড়ে গেলেন। মানুষ চিৎকার করে উঠল। তাদের ধারণা মূর্তী তাকে মেরে ফেলেছে। তারপর তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ ও তাঁর সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বলল এবার তোমরা যাও!

মুগীরা বিন শো'বা যখন দেখলেন মূর্তীর বিজয়ে তারা আনন্দিত হয়েছে, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে ছাক্বীফ গোত্রের লোকেরা! এটি একটি মূর্তী পাথর মাটি দিয়ে তৈরী। তোমরা আল্লাহ্র ক্ষমা গ্রহণ কর তাঁর ইবাদত কর। অতঃপর তিনি কুড়াল দিয়ে মূর্তীকে আঘাত করলেন এবং ভেঙ্গে দিলেন। তারপর ছাহাবীগণ মূর্তীর উপর চড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

প্রিয় পাঠক! আজ.. সমস্ত মাজার ও কবরের অবস্থা এবং এগুলোর তা'যীমকারীদের অবস্থা এরূপই। আল্লাহ্র নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)র নির্দেশ অনুযায়ী ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ বাস্তবায়নার্থে যদি কেউ এসমস্ত মাজার ও দরবার ভাঙ্গার কথা বলে, তবে লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। ওলীর শানে বেয়াদবী হয়েছে তাই ভয়ে কম্পমান থাকে। কি জানি কি ঘটে যায়...। অথচ কোন তাওহীদবাদী যদি শির্কের ঘাঁটি এ সমস্ত মাজার ভেঙ্গে

ফেলে তবে ঐ সমস্ত ওলী ও পীরদের প্রতিশোধ নেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। অবশ্য তাঁরা যদি প্রকৃত ওলী হয়ে থাকেন, তবে একাজে আরো খুশি হবেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ যারা আল্লাহ্‌র প্রকৃত ওলী-আওলিয়া তাঁরা শির্ককে আদৌ সমর্থন করেন না। কবর পাকা করতে.. বাঁধাই করতে.. গম্বুজ উঠাতে.. নিষেধ করবেন।[১]

কিভাবে শির্কের সূচনা হয়?

আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন পৃথিবীতে কিভাবে শির্কের সূচনা হয় তবে দেখবেন এর একমাত্র কারণ হল নেক লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি। তাদের যা মর্যাদা তার চাইতে বেশী তাদেরকে সম্মান করা। এজন্য যে কোন মানুষের কথা বিনা দলীলে অন্ধের মত মেনে নেয়া এবং বিশ্বাস করা শির্কের চোরাগলীর দরজা উম্মুক্ত করে।

নূহ (আ:) এর সম্প্রদায় তাওহীদ পন্থী ছিল। তারা এককভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করত। তার সাথে কাউকে শরীক করত না। সে সময় পৃথিবীর বুকে কোন শির্ক ছিল না। তাদের মধ্যে পাঁচ জন নেক লোক ছিল। ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুছ, ইয়াউক্ব ও নসর ছিল তাদের নাম। তারা ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং লোকদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যখন তারা মৃত্যু বরণ করলেন, কওমের লোকেরা খুবই চিন্তিত হল। বলল, যারা আমাদেরকে ইবাদতের কথা স্মরণ করাতো, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার নির্দেশ দিত তারা তো চলে গেলেন..।

শয়তান এসে তাদেরকে কুমন্ত্রনা দিল। বলল, তোমরা যদি তাদের ছবি তৈরী করতে মূর্তীর আকৃতিতে- আর তা মসজিদের কাছে রেখে দিতে, তবে তাদেরকে দেখলেই তোমরা তোমাদের ইবাদতে প্রাণ ফিরে পাবে এবং তৎপরতার সাথে ইবাদত বন্দেগী করতে পারবে। তারা তার কথা শুনল। তাদের প্রতিকী মূর্তী (ভাস্কর) তৈরী করা হল। উদ্দেশ্য তাদেরকে দেখে ইবাদত ও নেক কাজে স্পৃহা ও উদ্দীপনা লাভ করা।

---

[১] . হে আল্লাহ্‌! আমাদের মাঝে এমন একদল তাওহীদবাদী লোক দাও, যারা শির্কের আখড়া এসমস্ত মাজার ও দরবার ভেঙ্গে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র অধিকার খালেছ তাওহীদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। আমীন॥

বাস্তাবিকই তারা এ সমস্ত মূর্তীকে দেখে ইবাদত-বন্দেগীতে উৎসাহ অনুপ্রেরণা লাভ করত। অনেক বছর পার হয়ে গেল। এ প্রজন্ম বিদায় নিল। নতুন প্রজন্ম তাদের সন্তানগণ বড় হল। তারা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে তাদের বাপ-দাদারা এ সমস্ত মূর্তী সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলেন। তাদেরকে সম্মান করেন। কেননা তারা নেক লোকদের কথা তাদেরকে স্মরণ করায়।

তাদের পর আর এক প্রজন্ম দুনিয়ায় এল। ইবলিস তাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের আগে যারা ছিল (তোমাদের বাপ-দাদারা) এগুলোর ইবাদত করত! দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি বা বিপদ-আপদে তারা এগুলোর আশ্রয় কামনা করত। সুতরাং তোমরাও এগুলোর ইবাদত কর।

তারা তাদের ইবাদত শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে হযরত নূহ (আ:)কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ঐ সমস্ত মূর্তীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানালেন। সাড়ে নয়'শ বছর তিনি দা'ওয়াত দিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক দা'ওয়াত কবূল করল। তারা বলল,

﴿لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

"তোমরা তোমাদের মা'বূদদেরকে ছেড়ো না, তোমরা ছাড়িও না ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুছ, ইয়াউক্ব ও নসরকে।" (সূরা নূহ: ২৩) ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর রাগন্বিত হলেন। বন্যায় ডুবিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন..। দুনিয়া থেকে শির্ক মিটে গেল। এ হল নূহ (আ:)এর সম্প্রদায়ের লোকদের ঘটনা।

ইবরাহীম (আ:)এর কওমের মধ্যে কিভাবে শির্কের সূচনা হল? তারা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত এগুলো জগত নিয়ন্ত্রন করে, বিপদাপদ দূরীভূত করে, দু'আ কবূল করে, প্রয়োজন পূরণ করে। তারা বিশ্বাস করত এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ্ ও সৃষ্টি জগতের মাঝে মধ্যস্থতাকারী এবং তাদেরকে দেয়া হয়েছে পৃথিবী পরিচালনার দায়-দায়িত্ব। এ বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে তারা অনুমানের ভিত্তিতে গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেস্তা প্রভৃতির মূর্তী তৈরী করে সেগুলোর ইবাদত করত।

ইবরাহীম (আ:)এর পিতা মূর্তী তৈরী করে ছেলেদের দিয়ে বাজারে বিক্রি করত। সে ইবরাহীমকেও মূর্তী বিক্রয় করার জন্য বাজারে যেতে চাপ দিত। তিনি বাজারে যেতেন আর বিক্রয় করার সময় হাঁক ছাড়তেন, কে খরিদ করবে

এমন বস্তু যা উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতা রাখে না...। অন্য ভায়েরা মূর্তী বিক্রয় করে বাড়ি ফিরত। আর তিনি মূর্তী নিয়ে ফেরত আসতেন। এরপর তিনি পিতাকে এবং কওমের লোকদেরকে আহ্বান জানালেন এ সমস্ত মূর্তীকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না। ফলে তিনি মূর্তীগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। কওমের লোকেরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আগুনকে আদেশ দিলেন,

﴿يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾

"হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা এবং শান্তি হয়ে যাও।" (সূরা আম্বিয়া- ৬৯)

****

শির্কের উত্তরাধিকারী

এতক্ষণ আমরা নূহ ও ইবরাহীম (আ:) এর সম্প্রদায়ের লোকদের শির্কের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলাম। এবার আমরা প্রশ্ন রাখি বর্তমান যুগের দরগাহ ও কবর পূজারী মুশরেকদের কাছে, কিভাবে তোমাদের মধ্যে শির্কের অনুপ্রবেশ হল? উত্তর কবর ও মাজারের মাধ্যমে। কবর ও মাজারের সাথে কিভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠল- যার ফলাফল হল আল্লাহ্র সাথে শির্ক?

সম্পর্কের মাধ্যম হল, নেক ও পরহেযগার লোকদেরকে শ্রদ্ধা ও অতিভক্তি করার মধ্য দিয়ে। এথেকে তাদের দরবার, কবর ও মাজার যিয়ারতকে পূণ্যের কাজ মনে করা হল। তাদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য নয় মৃত্যু বা আখেরাতকে স্মরণ করা; বরং উদ্দেশ্য হল, নেককার শাইখ বা পীর সাহেবকে স্মরণ করা, তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তারপর সেখানে দু'আ করলে কবূল হবে এ আশায় দু'আ শুরু হল। শুরু হল কবরকে স্পর্শ করা ও চুম্বন। তারপর তাকে মনে করা হল আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশের উসীলা বা মাধ্যম।

তাদের ধারণা হল এ সমস্ত মাজারের অধিবাসীগণ পবিত্র ও সম্মানিত, নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মহান, আল্লাহ্র কাছে তাদের বিশেষ স্থান রয়েছে... অন্যদিকে তারা হল গুণাহগার-পাপী ও মূর্খ, সরাসরি আল্লাহ্কে ডাকা তাদের জন্য সমিচীন নয়। সুতরাং কবরের অধিবাসী পীর-বুযুর্গই নিঃসন্দেহে হতে পারেন তার এবং আল্লাহ্র মাঝে মধ্যস্থতাকারী।

এরপর শয়তান সেই যিয়ারতকারীর অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়.. যখন কিনা ইনি পবিত্র ও সম্মানিত.., হতে পারে আল্লাহ্ তাকে কিছু না কিছু ক্ষমতা বা প্রভাব দিয়েছেন..। তখন উদয় হয় তার হৃদয়ে মাজার সম্পর্কে মহত্ম ভয়-ভীতি ও আশা-আকংখা।

এর পরের অধ্যায় হল শির্কের বাস্তব প্রয়োগ। সেখানে তৈরী হয় মসজিদ.. দরগাহ.. মাজার.. গম্বুজ..। জালানো হয় মোমবাতি-আগরবাতী। পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়.. লাল সবুজ কাপড় লটকিয়ে রাখা হয়.. কখনো মশারিও টানানো হয়। তারপর তার কাছে দু'আ চায়, তার কাছে উদ্ধার কামনা করে। কখনো সিজদা করে.. তওয়াফ করে.. কবরকে চুম্বন ও স্পর্শ করে..। উরূসের নামে সেখানে পশু যবেহ্ হয়। কারামতের নাম করে নানা ধরণের মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনীর অবতারনা করা হয়.. উমুক নারী এখানে এসে দু'আ চাওয়াতে স্বামী পেয়েছে.. উমুক নারী সন্তান লাভ করেছে। অনেকে প্রচার করে 'কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা তোমার দরবার হতে'। অর্থাৎ যে কোন মাজারে গেলেই প্রয়োজন পূরণ হবে.. উদ্দেশ্য হাসিল হবে..।

জনৈক ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করা হল- তুমি ক্রেতাদের সামনে ওলীর নাম নিয়ে কসম কর অথচ আল্লাহ্র নাম নিয়ে কসম করো না কি ব্যাপার? সে জবাব দিল যতক্ষণ উমুক মাজারের ওলীর নামে আমি কসম না করি ওরা আমার কথা বিশ্বাস করে না।

দেখুন! কিভাবে এরা আল্লাহ্র চাইতে মাজারের ওলীকে বেশী সম্মান করে? এবার চিন্তা করে দেখুন কি পার্থক্য থাকতে পারে একটি মাটির ঢিবি.. পাথর বা কাঠ.. মাজার বা দরগাহ.. ছবি বা মূর্তী.. বা যে কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে? কোন পার্থক্য নেই। মোট কথা মানুষ এসবের কাছে যায়। এগুলোর কাছে গোপন কিছু আছে বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে এরা উপকার-অপকারের ক্ষমতা রাখে, অভাব দূর করতে পারে, আরোগ্য দিতে পারে..।

ছাহাবী আবূ রাজা আল আত্বারেদী জাহেলিয়াতের যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার মাঝে এবং এ সমস্ত কবর পূজারীদরে কার্যকলাপে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন: "আমরা জাহেলী যুগে মূর্তী পূজা করতাম.. বৃক্ষ ও পাথরের উপাসনা করতাম। আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, একটি পাথরের ইবাদত করতে করতে যদি তার চাইতে ভাল কোন পাথর দেখতে পেতাম, তবে সেটা

ছেড়ে দিয়ে নতুনটার ইবাদত শুরু করতাম। যদি কোন পাথর না পেতাম তবে কিছু মাটি একত্রিত করে ঢিবি বানাতাম। তারপর তার উপর ছাগলের দুধ দহন করতাম- অতঃপর তার তওয়াফ করতাম। একবার সফরে বের হলাম- সাথে ছিল একটি পাথর যার আমরা ইবাদত করতাম। তা রাখতাম চামড়ার থলের মধ্যে। খাদ্য রান্না করার জন্য আমরা যখন আগুন জ্বালাতাম আর চুলা তৈরী করার জন্য তৃতীয় কোন পাথর না পেতাম তখন আমাদের মা'বূদ পাথরটি সেখানে সেট করতাম আর বিশ্বাস করতাম এটির কারণে আগুন বেশী জ্বলবে।

একবার কোন এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। চামড়ার থলে থেকে মা'বূদ পাথরটিও বের করলাম। বিশ্রাম শেষে সেস্থান থেকে চলে যাওয়ার পর একজন চিৎকার দিয়ে উঠল। তোমাদের রব হারিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে বের কর। তখন সবাই মিলে উটের পিঠে চড়ে সর্বস্থানে আমাদের রবকে খুঁজতে শুরু করলাম। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে একজনের চিৎকার শোনা গেল। সে বলছে, তোমাদের রবকে পাওয়া গেছে এবং তার অনুরূপ আর একটি রব (মূর্তী) পাওয়া গেছে। তখন আমি আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে দেখি আমার সাথীরা একটি মূর্তীকে সিজদা করছে। তারপর খুশিতে সেই মূর্তীর সম্মানে আমরা একটি উট যবেহ করলাম।"

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে জাহেলদের এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। তার চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল নব্য জাহেলিয়াতের মূর্খদের অবস্থা। আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, পাথর পূজা আর কবর পূজার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? কি পার্থক্য আছে সেই ব্যক্তির মাঝে যে মূর্তীর কাছে নিজ প্রয়োজনের কথা বলে আর যে গলীত মাটি মিশ্রিত হাড্ডির কাছে যায়। যে ওলী-আউলিয়ার কবরের ইবাদত করে আর যে পানি-কাদা দ্বারা তৈরী মূর্তীর ইবাদত করে। কোনই পার্থক্য নেই। কেননা এদের সবারই কথা এক, 'আমরা এদের ইবাদত এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দিবে।' আর এ কথাই কবর পূজারীদেরকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মূর্তী পূজায় লিপ্ত করেছে।

*****

চারটি প্রশ্ন..

প্রথম: কবর পূজারীদের কেউ কেউ বলতে পারে। তোমরা আমাদের উপর বেশী বাড়াবাড়ি করছ। আমরা তো কোন মৃতের ইবাদত করি না। এ সমস্ত ওলী-আউলিয়া নেক লোক। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তারা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করতে পারেন।

জবাবে আমরা বলব: এটাই ছিল কুরাইশ কাফেরদের কথা তাদের মূর্তী সম্পর্কে। আরবের মুশরিকগণ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্‌কে[1] স্বীকার করত। তাদের বিশ্বাস ছিল স্রষ্টা, রিযিকদাতা নিয়ন্ত্রনকর্তা.. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। এসব ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন তাদের কথা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"আপনি বলুন! কে আসমান ও যমীন থেকে তোমদেরকে রিযিক দান করে? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্যে থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না?" (সূরা ইউনূস- ৩১) এরপরও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদের রক্তপাত ও সম্পদ বৈধ করেছেন। কেননা তারা সব ধরণের ইবাদত এককভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করেনি।

কুরআনের আয়াতে ও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছে গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদতের ব্যাপারে যে সব নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা থেকে বুঝা যায়- শির্ক হল,

[1]. তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্ বলা হয়, আল্লাহ্‌কে তাঁর কর্মসমূহে একক হিসেবে মেনে নেয়া। যেমন- সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করা, উদ্ভিদ উৎপাদন করা ইত্যাদি। পূর্ব যুগের কাফের ও মুশরিকগণ এই তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই স্বীকৃতি ইসলাম মেনে নেয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের জান-মাল হালাল ঘোষণা করেছিলেন।

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র জন্য কোন শরীক নির্ধারণ করার নাম। চাই উক্ত শরীক মূর্তী হোক বা পাথর বা নবী বা ওলী বা কবর বা মাজার। শির্ক হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য যা নির্দিষ্ট তা থেকে কিছু অংশ গাইরুল্লাহ্র জন্য করা। চাই উক্ত বস্তুর নাম জাহেলী যুগের নামের মত হোক যেমন মূর্তী বা প্রতিমা বা অন্য কোন নাম হোক যেমন ওলী বা কবর বা মাজার।

বর্তমান যুগে যদি কোন দল প্রকাশ হয়ে দাবী করে ও ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্র স্ত্রী সন্তান আছে তবে তাদের বিধান খৃষ্টানদের বিধানের মত হবে। আর খৃষ্টানদের ব্যাপারে যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে সবগুলোই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যদিও তারা নিজেদেরকে খৃষ্টান হিসেবে গণ্য না করে। কেননা তাদের উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরূপই হল বর্তমান যুগে কবর পূজার ব্যাপারটি।

দ্বিতীয়: কবরের সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে, আমরা কবরস্থিত ওলী-আউলিয়াদের নিকটে শুধু মাত্র শাফাআত লাভের আশায় গিয়ে থাকি। এ সমস্ত ব্যক্তি দুনিয়ায় অতি নেকবখত ছিলেন। দিনে ছিয়াম পালন করতেন, রাতে ক্রন্দন করে ছালাত আদায় করতেন.. নি:সন্দেহে আল্লাহ্র কাছে তাদের আলাদা মান-মর্যাদা রয়েছে। আমরা শুধু এ আশা করি যে, তাঁরা আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন।

আমরা তাদেরকে বলব: ওহে ভাই! আল্লাহ্ তোমাদের হেদায়াত করুন! তোমরা আল্লাহ্র দাঈর ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সুপারিশকারী গ্রহণ করাকেই শির্ক বলেছেন। তিনি এরশাদ করেন:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা এমন বস্তুর উপাসনা করে যা তাদের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না এবং বলে এরা আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পূত:পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছো।" (সূরা ইউনূস- ১৮)

আমরা তোমাদের মতই বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ নবী ওলীদেরকে সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন। কেননা তাঁরাই আল্লাহ্র সর্বাধিক নিকটবর্তী বান্দাহ্। কিন্তু আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তাদের কাছে কোন কিছু চাইতে বা তাদেরকে দু'আ করতে। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী, ওলী, শহীদ.. প্রভৃতিদেরকে সুপারিশ করার অধিকারী করেছেন। কিন্তু তাদের অধিকারে এ ক্ষমতা নেই যে, যাকে ইচ্ছা তারা সুপারিশ করবেন.. যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করবেন না। কখনই নয়, বরং আল্লাহ্র অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সুপারিশই করবেন না। আর এ সুপারিশ শুধু হবে ক্বিয়ামত ময়দানে।

তৃতীয়ঃ মাজার পূজারীদের কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে- অধিকাংশ মুসলমান পূর্ব যুগে বা বর্তমান যুগে তো কবরের উপর ঘর তৈরী করে.. দরগাহ বানায়.. গম্বুজ নির্মাণ করে.. সে সমস্ত স্থানে দু'আ করতে সচেষ্ট হয়। তাহলে কি এত সব মানুষ বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত? আর তোমরাই শুধু হকের উপর প্রতিষ্ঠিত?

জবাবে আমরা বলব, এ সমস্ত দরগাহ্ ও মাজারের অধিকাংশই মিথ্যা। তাদের নামে এ সমস্ত মাজারকে সম্বন্ধ করা সঠিক নয়, যেমনটি ইতপূর্বে আপনি দেখেছেন। তাছাড়া কবরের উপর ঘর তৈরী.. সেখানে বেশী করে দু'আ করতে সচেষ্ট হওয়া.. প্রভৃতি জঘণ্য ধরণের বিদআত। যেমনটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লা'নত (অভিশাপ) করেছেন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে কেন্দ্র করে মসজিদ তৈরী করেছে। একথা বলে তিনি তাদের কৃতকর্ম থেকে মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম) তাছাড়া কবরকে পাকা করা, তার উপর ঘর উঠানো, তার নাম পরিচয় লিখা, তার উপর বসা, চলা, হেলান দেয়া.. সবই ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হারাম কাজ। (দেখুন মুসলিম, আবূ দাঊদ প্রভৃতি)

চতুর্থঃ কারো কারো অন্তরে শয়তান আর একটি সংশয় সৃষ্টি করতে পারে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তো মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট- অথচ এতে কোন প্রতিবাদ নেই? যদি মসজিদে কবর থাকা হারাম হত তবে তাঁকে মসজিদের মধ্যে দাফন করা হত না। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর শরীফের উপর গম্বুজও আছে?

উত্তর: নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে মৃত্যু বরণ করেছেন সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। কেননা হাদীছে এসেছে, "নবীগণ যেস্থানে মৃত্যু বরণ করেন সেখানেই তাঁদেরকে দাফন করা হয়।" তাই তাঁকে আয়েশা (রা:) এর গৃহে দাফন করা হয়েছে- তাঁকে মসজিদে দাফন করা হয়নি। এটা ছিল প্রথম অবস্থার কথা। ছাহাবায়ে কেরাম নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ অনুযায়ী তাঁকে আয়েশার গৃহে দাফন করেন। যাতে করে তাঁদের পর কেউ তাঁর কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে না পারে। যেমনটি আয়েশা (রা:) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে। তিনি বলেন,

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমূর্ষু অবস্থায় বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লা'নত (অভিশাপ) করেছেন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।" হযরত আয়েশা বলেন, উক্ত নির্দেশ এবং এ হাদীছ যদি না থাকত, তবে তাঁর কবরকে বাইরে রাখা হত। কিন্তু তিনি ভয় করেছিলেন যে, তাঁর কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশার ঘর পূর্ব দিকে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। বছর গড়াতে থাকলো, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো.. ছাহাবীগণও কবরের দিক বাকি রেখে অন্যান্য দিক প্রশস্থ করলেন। প্রশস্থ হল পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষীণ দিকে- পূর্ব দিকে নয়, কেননা সেদিকে কবর থাকার কারণে তা প্রশস্থ করা সম্ভব হয়নি। ৮৮ হিজরী তথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের ৭৭ বছর পর- যখন মদীনায় বসবাসকারী অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম মৃত্যু বরণ করেছেন। উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করার জন্য তা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন মসজিদকে চতুর্দিক থেকে বৃদ্ধি করার। এমনকি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীদের ঘরগুলোকেও সংশ্লিষ্ট করার আদেশ দিলেন। সে সময় পূর্ব দিকে মসজিদ বৃদ্ধি করা হল এবং

আয়েশা (রা:) এর ঘর তথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর শরীফকে মসজিদের মধ্যে করে দেয়া হল। (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া ২৭/৩২৩, তারিখু ইবনু কাছীর ৯/৭৪)

এ হল কবর এবং মসজিদের ঘটনা..

সুতারাং ছাহাবায়ে কেরামের পর যা ঘটেছে তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা কারো জন্য কোন ক্রমেই বৈধ হবে না। কেননা তা সুস্পষ্ট ও ছহীহ্ হাদীছ সমূহ এবং সালাফে ছালেহীনের নীতি বিরোধী কথা। কোন সন্দেহ নেই যে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরকে মসজিদের মধ্যে শামিল করে খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ভুল করেছেন। (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন) কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের উপর ঘর তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। উচিত ছিল অন্যান্য দিকে মসজিদকে বৃদ্ধি করা কবরের দিকে নয়- যেমন ছাহাবায়ে কেরামের যুগে হয়েছিল। এমনিভাবে কোন কবরের উপর গম্বুজও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে তৈরী হয়নি। ছাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈন বা তাবেতাবেঈনদেরও কারো যুগে হয় নি। এমনকি মুসলিম মিল্লাতের অনুসরণীয় ইমামদের কারো যুগেও তা ঘটেনি। বরং নবীজির কবরের উপর এ গম্বুজ তৈরী করেছে পরবর্তী যুগের জনৈক মিছরী বাদশাহ্ ৬৭৮ হিজরীতে। তার নাম ছিল 'কলাউন ছালেহী' কিন্তু সে পরিচিত ছিল 'মানছূর' নামে। (তাহযীর সাজেদ আলবানী ৯৩পৃ:, ছরাউন বাইনাল হাক্বি ওয়াল বাতিল- সা'দ ছাদেক ১০৬ পৃ:, তাত্বহীরুল ই'তিক্বাদ ৪২পৃ:)

আহ্বান.. আহ্বান..

কবর সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে আমি বলব, হে ভাই আসুন! আল্লাহ্র দাঈর ডাকে সাড়া দিন এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনুন। আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি এমন কিছু জানেন যে, সালাফে ছালেহীনের মধ্যে কেউ কবরকে পাকা করেছেন বা তাকে চুনকাম করেছেন বা তার উপর ঘর তৈরী করেছেন? অথবা কোন মানুষের কাছে আশা-আকাংখা পেশ করেছেন? অথবা কোন মাজার বা দরগাহের উসীলা করেছেন? আর মহাজ্ঞানী বাদশাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা থেকে তাঁরা উদাসীন থেকেছেন?

আপনারা কি জানেন ছাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈন বা তাবেতাবেঈন বা অনুসরণীয় ইমামদের (রা:) কেউ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কবরের কাছে

দন্ডায়মান হয়ে বা কোন ছাহাবীর কবরের কাছে বা নবী পরিবারের (আহলে বায়ত) কোন ব্যক্তির কবরের কাছে দন্ডায়মান হয়ে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বা বিপদোদ্ধারের জন্য তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছেন?

আপনারা কি মনে করেন আহমাদ রেফায়ী, দোসক্বী, আবদুল কাদের জিলানী, বাদাভী, (খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, শাহজালাল. শাহমাখদুম, শাহপরাণ, বারো আওলিয়া, বায়েজীদ বোস্তামীসহ দুনিয়ার হাজার হাজার মাজারের পীরগণ) আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয় ও সম্মানিত এবং তাঁর কাছে পৌঁছার সর্বোত্তম মাধ্যম নবী-রাসূল এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের থেকে?

হযরত ওমার (রা:) এর যুগে ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দেখুন, যখন মদীনায় অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দেয়, তখন ওমার (রা:) ছাহাবীদেরকে নিয়ে ইস্‌তেস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনা) ছালাত আদায় করার জন্য বের হন। তিনি দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করেন, হে আল্লাহ্‌ পূর্বে যখন আমরা খরার সম্মুখিন হতাম তখন তোমার নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য যে দু'আ করতেন তোমার কাছে তার উসীলা করতাম, তারপর তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতে। আজ আমরা তোমার নবীর চাচা আব্বাস (রা:) এর (দু'আর) উসীলা করছি। অতঃপর তিনি আব্বাস (রা:)কে বললেন, হে আব্বাস! উঠুন এবং বৃষ্টি নাযিল হওয়ার জন্য আপনি দু'আ করুন। তখন আব্বাস দন্ডায়মান হয়ে দু'আ করলেন, লোকেরা তাঁর দু'আয় আমীন বলল, ক্রন্দন করল কাকুতি-মিনতী করল.. শেষ পর্যন্ত তাদের মাথার উপর মেঘমালা ভেসে উঠল এবং বৃষ্টি হল।

দেখুন ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা! তাঁরা আমাদের চাইতে বেশী বুঝতেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সর্বাধিক ভালবাসতেন। যখন তাঁরা প্রয়োজনের সম্মুখিন হলেন, বিপদে পড়লেন তাঁরা গেলেন না নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের কাছে.. এরূপ বললেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করুন... কখনই না.. তাঁরা ভালভাবেই জানতেন কোন মৃতের কাছে দু'আ করা যায় না। হোক না তিনি নবী-রাসূল বা আল্লাহ্‌র প্রিয় কোন কোন ওলী।

আফসোস! বর্তমান কালের মিসকীনদের অবস্থা দেখে! কিভাবে তারা গলিত হাড়-হাড্ডির কাছে ধর্ণা দিচ্ছে, সেখানে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্য ভিড় করছে!

হে জাতি! ধিক্কার তোমাদেরকে! তোমরা কি মনে কর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ছবি, মূর্তী প্রভৃতি নিষেধ করেছেন- তা এমনিই করেছেন? নাকি তিনি ভয় করেছিলেন যে, মুসলমানগণ ছবি.. মূর্তীর ইবাদত শুরু করে দিবে এবং পূর্ব জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করবে? কি পার্থক্য আছে ছবি মূর্তীকে তা'যীম করা ও কবর-মাজারকে তা'যীম করার মধ্যে? যখন কিনা উভয়টিই মানুষকে শির্কের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং তাওহীদের আক্বীদাহকে বিনষ্ট করে?

****

গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথ করা.. শির্কের অন্যতম মাধ্যম

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে শপথ করা হারাম। যেমন কা'বার নাম নিয়ে শপথ করা, আমানতের নাম নিয়ে, মর্যাদার দোহাই দিয়ে, উমুকের বরকতের দোহাই দিয়ে, কোন নবী বা ওলীর নাম নিয়ে, পিতা-মাতার নাম নিয়ে, ইত্যাদির নাম নিয়ে শপথ করা সবই হারাম। (এমনিভাবে সন্তানের মাথায় হাত রেখে, রাতকে সাক্ষি রেখে, খাদ্যকে সাক্ষি রেখে, মাটি হাতে নিয়ে.. কথা বলা বা শপথ করা গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথের অন্তর্ভূক্ত।) কেননা শপথ মানে সম্মান যা আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্য জায়েয নয়। ইমাম আহমাদ মারফূ সূত্রে ইবনু ওমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ فَقَدْ أشْرَكَ) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে শপথ করবে সে শির্ক করবে।" (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, (مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِف بِاللهِ أوْ لِيَصْمُتْ) "কেউ যদি শপথ করে তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথচ যেন নীরব থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

যদি কোন মানুষ গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বিশ্বাস রাখে যে শপথকৃত বস্তু বা ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ্‌র মর্যাদার ন্যায় তবে তা শির্কে আকবার বা বড় শির্ক। আর যদি বিশ্বাস করে তা আল্লাহ্‌র নিম্ন পর্যায়ের তবে তা শির্ক আছগার বা ছোট শির্ক।

যদি কোন ব্যক্তির মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃত এরূপ শপথ বের হয়ে যায় তবে তার কাফ্ফারা হল, তৎক্ষণাত সে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে। যেমনটি ছহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কেউ যদি (অসতর্কতার কারণে) 'লাত' বা 'উয্যা'র নামে শপথ করবে সে যেন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" আর যে ব্যক্তির মুখ থেকে এরূপ কথা বেশী বেশী বের হয় সে যেন তা পরিত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করে।

আরো কিছু কথা যা মানুষের মুখ থেকে সহজেই বের হয়, যেমন- 'আপনি যদি না থাকতেন', 'আল্লাহ্ এবং আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই', 'এটা আল্লাহ্ এবং আপনার বরকতের ফল' ইত্যাদি। এসব কথাও শির্কের বাহণ। বরং বলবে: 'আল্লাহ্ যা চান অত:পর আপনি যা চান'.., 'আল্লাহ্র রহমত যদি না হত অতঃপর আপনি যদি না থাকতেন'..।

তাবীজ-কবচ ব্যবহার..

তাবীজ-কবচ, সুতা, তাগা, রিং, বালা ইত্যাদি ব্যবহার করা। জ্বিন বা বদনযর থেকে বাঁচা, অসুখ থেকে মুক্ত হওয়া.. ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ এগুলো ব্যবহার করে থাকে। কেউ যদি এগুলো উদ্দেশ্য পূরণের 'মাধ্যম' হিসেবে ব্যবহার করে তবে তা হবে ছোট শির্ক। কিন্তু যদি বিশ্বাস করে যে এগুলোই উদ্দেশ্য হাসিল করে দিবে, বালা-মুছীবত দূর করে দিবে তবে তা হবে বড় শির্ক। কেননা এতে গাইরুল্লাহ্র সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছে। আল্লাহ্র সাথে গাইরুল্লাহ্কে নিয়ন্ত্রনকর্তা বা উপকার-অপকারের মালিক নির্ধারণ করেছে।

তাবীজ দু'প্রকার:

১ম প্রকার: কুরআন থেকে। যেমন কাগজ, কাপড়, চামড়া ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজ হিসেবে ব্যবহার করা। এটা জায়েয নয়। কেননা এরূপ করা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন সূত্রেই প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এরূপ তাবীজ অন্য তাবীজের রাস্তা উন্মোচন করবে।

২য় প্রকার: কুরআন ছাড়া অন্য কিছু। যেমন জিনের নাম, যাদুকরদের বিশেষ চিহ্ন.. বিশেষ ধরণের নম্বর.. ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে শির্কের বাহণ।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أشْرَكَ) "যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করবে সে শির্ক করবে।" (আহমাদ, হাকেম) আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা:) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবীজ কেটে ফেলবে, সে একটি কৃতদাস আযাদ করার ছওয়াব পাবে।' হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) একবার জনৈক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে আসেন। লোকটি হাতে একটি লোহার রিং পরিধান করেছিল। তিনি বললেন, এটা কি? সে বলল, দূর্বলতার কারণে এটা পরিধান করেছি। তিনি বললেন, এ রিং খুলে ফেল। কেননা এটা তো তোমার দুর্বলতাকে আরো বৃদ্ধি করবে। এবস্তু হাতে রেখে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে কখনই সফলকাম হবে না।'

এমনিভাবে ঝাড়-ফুঁক। বিভিন্ন দু'আ-যিকির যা অসুস্থ ব্যক্তির উপর পাঠ করা হয়। এর মধ্যে জায়েয শুধু তাই যা আল্লাহ্র কালাম বা তাঁর নাম ও গুণাবলীর দ্বারা হবে, যেমন অসুস্থ ব্যক্তির উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা বা সূরা ইখলাছ, ফালাক, নাস.. পাঠ করা। অথবা ছহীহ্ হাদীছ থেকে প্রমাণিত যে কোন দু'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা। কিন্তু ঝাড়-ফুঁক করার সময় কোন জ্বিনের নাম নেয়া বা ফেরেস্তা নবী বা ওলী-আওলিয়ার নাম নেয়া গাইরুল্লাহকে ডাকার শামিল যা বড় শির্ক হিসেবে গণ্য।

ঝাড়-ফুঁক বৈধ হওয়ার পদ্ধতি: কুরআন বা প্রমাণিত দু'আ থেকে পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁ দিবে। অথবা পানিতে ফুঁ দিয়ে উক্ত পানি রুগীকে পান করতে দিবে।

ইলমে গায়বের দাবী করা

গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নেই। কেউ যদি গয়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে তবে সে মুশরিক এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"আপনি বলে দিন আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ গায়েবের খবর জানে না।" (সূরা নমল- ৬৫) তিনি আরো বলেন, "একমাত্র তাঁর কাছে অদৃশ্যের যাবতীয় চাবি-কাঠি রয়েছে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না।" (সূরা আন'আম -৫৯)

সুতরাং কারো জন্য কখনই.. কখনই.. সম্ভব নয় অদৃশ্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করা। হোক সে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তা, প্রেরীত নবী, ওলী, অনুসরণীয় ইমাম..। কখনই নয়.. অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কোন সংবাদ জানে না।

তবে কোন নবী বা রাসূলকে আল্লাহ্ যে সমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ দান করেছেন সে কথা ভিন্ন। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, কাফেরদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়েছেন...। কেননা এটা গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবীর অন্ত র্ভূক্ত নয়। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

"আপনি বলে দিন, আমি দাবী করি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ভান্ডার সমূহ রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের সংবাদও জানি না।" (সূরা আন'আম- ৫০)

সুতারং কেউ যদি যে কোন প্রকারে অদৃশ্য সংবাদ প্রকাশের দাবী করে যেমন হস্ত রেখা পড়ে বা বাটি ঘুরিয়ে বা নক্ষত্র দেখে বা ভবিষ্যদ্বানী করে বা যাদু করে, সে মিথ্যুক ও কাফের। আর গণকদের থেকে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায় যেমন, হারানো বস্তু বা অদৃশ্য কোন বিষয় সম্পর্কে খবর প্রদান, অসুস্থতার কারণ বলে দেয়া.. ইত্যাদি তারা জ্বিন শয়তানের মাধ্যমে করে থাকে।

দুর্বল ঈমানের কিছু লোক এ সমস্ত জ্যোতির্বিদের কাছে গিয়ে তাদের ভবিষ্যত.. বিবাহ.. বিদেশ গমণ.. ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। তা হারাম। কেননা যে ব্যক্তি ইলমে গাইবের দাবী করবে অথবা যে ব্যক্তি তাদের কথা বিশ্বাস করবে সে কাফের ও মুশরিক।

যাদু, জ্যোতির্বিদ্যা, গণনা..

যাদু: কিছু কথা-মন্ত্র, কলাকৌশল, ঔষুধ, ধোঁয়া.. প্রভৃতির সমম্বয়ে যাদু সংঘটিত হয়ে থাকে। এর বাস্তবতা আছে। তা প্রভাবিত হয় মানুষের অন্তরে শরীরে। ফলে সে অসুস্থ হয়.. মারা যায়.. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে।

এটি একটি বড় ধরণের গুণাহ। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ..)

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থেকো। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, যাদু করা.. ।" (মুসলিম)

যাদুর মধ্যে শয়তানকে ব্যবহার করা হয়, তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়, সে যা চায়, তার সামনে পেশ করা হয়- যাতে করে শয়তান যাদুকরের খিদমত করতে পারে। যাদুর মধ্যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করা হয়- যা সুস্পষ্ট কুফরী ও বিভ্রান্তি। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾

"তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।" (সূরা ত্বোয়াহা- ৬৯)

যাদুকরের বিধান হল, তাকে হত্যা করা। যেমনটি ছাহাবীদের (রাঃ) একদল তা করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়! আমরা এমন যুগে বসবাস করছি মানুষ যখন যাদুকে খুবই নগণ্য বিষয় মনে করছে। বরং এটাকে একটি আর্ট হিসেবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে, তা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। যাদুকরদের বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। যাদুর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে- যাতে হাজার হাজার দর্শকের সমাগম ঘটছে। প্রকৃত পক্ষে এটা হল ইসলামী আক্বীদাহ্‌র প্রতি উদাসীনতা ও সে সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

একটি শিক্ষনীয় ঘটনাঃ প্রখ্যাত ছাহাবী আবু যর জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) জনৈক যাদুকরের সাথে কি সুন্দর আচরণই না করেছিলেন। একদা তিনি জনৈক আমীরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, আমীরের দরবারে এক যাদুকর তরবারী হাতে নিয়ে খেলা করছে। মানুষকে দেখাচ্ছে সে যেন তারবারী দিয়ে একজন লোকের মাথা কেটে ফেলছে আবার তা যথাস্থানে স্থাপন করছে। পরবর্তী দিন আবু যর একটি চাদরের নীচে তরবারী লুকিয়ে নিয়ে আমীরের দরবারে প্রবেশ করলেন। তখন উক্ত যাদুকর আমীরের সামনে তরবারী নিয়ে আগের মত খেলা করছে। মানুষকে যাদুর ধাঁধাঁয় বেধে রেখেছে। মানুষও আশ্চর্য হচ্ছে চমৎকৃত হচ্ছে।

আবু যর যাদুকরের কাছে গিয়ে আকস্মাৎ তরবারী বের করলেন এবং তাকে দিখন্ডিত করে ফেললেন। দেহ হতে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যাদুকর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর আবু যর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি: (حد الساحر ضربه بالسيف) "যাদুকরের দন্ড হল, তাকে তরবারী দ্বারা দ্বিখন্ডিত করা।" (তিরমিযী, তবে শাইখ আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেন। অবশ্য মওকূফ সূত্রে হাদীছটি ছহীহ।) অত:পর আবু যর যাদুকরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন: 'এবার তুমি নিজেকে বাঁচাও! এখন তুমি নিজেকে বাঁচাও!!'

***

জ্যোতির্বিদ্যা, গণনা: আবু হুরায়রা ও হাসান (রা:) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "যে ব্যক্তি কোন জ্যোতির্বিদ বা গণকের নিকট আগমণ করবে, অতঃপর সে যা বলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাযিলকৃত ইসলামের সাথে কুফরী করবে।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্, দারেমী) অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)

"যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদের নিকট আগমণ করে কোন বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবূল করা হবে না। (মুসলিম)

সতর্ক থাকা উচিত: যাদুকর, জ্যোতির্বিদ, গণক প্রভৃতিগণ মানুষের আক্বীদাহ্ নিয়ে খেলাধুলা করে। তারা চিকিৎসকের নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর রোগীদেরকে গাইরুল্লাহ্‌র নামে নিভিন্ন ধরণের পশু যবেহ্ করার নির্দেশ দেয়.. উমুক পদ্ধতিতে খাসি যবেহ্ করবে.. মুরগী যবেহ করবে.. ইত্যাদি।

কখনো এরা রুগীদেরকে শয়তানী তাবীজ, শির্কী রক্ষা-কবচ লিখে দিয়ে থাকে- যা মানুষ বিভিন্ন ধরণের মাদুলীতে পুরে গলায় বা হাতে বা কমরে লটকিয়ে থাকে। অথবা বাড়ির ছাদে টাঙ্গিয়ে রাখে বা ঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখে..। অথচ সাধারণ মানুষ এগুলোর হাক্বীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

তাদের কেউ কেউ ওলীর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। নানারকম কারমতী দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে। যেমন নিজেকে অস্ত্র দিয়ে

আঘাত করে বা নিজেকে গাড়ির চাক্কার নীচে বিছিয়ে দেয়- অথচ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না কোন ক্ষতি হয় না। প্রকৃতপক্ষে যাদুর মূল হল শয়তানী কর্ম।

জনৈক যুবকের ঘটনা। একবার সে কোন এক দেশে ভ্রমণে যায়। তারপর সে দেশের কোন নাট্য মঞ্চে গমণ করে। সে বিভিন্ন ধরণের খেলা উপভোগ করছে। এমন সময় দেখা গেল একজন মহিলা আশ্চর্য ভঙ্গিতে একটি রশির উপর দিয়ে হেঁটে চলছে। নীচে লাফিয়ে পড়ছে আবার লাফ দিয়ে উপরে উঠছে। সে যেন একটি মাকড়শা। মানুষ খুবই আশ্চর্য হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তা অবলোকন করছে।

যুবক মনে মনে বলল, এগুলো কোন প্রশিক্ষণ মূলক খেলা তা মোটেও সম্ভব নয়। নিশ্চয় এ যাদু। সে চিন্তা করল, হতে পারে আমি গুনাহগার; কিন্তু আমি তো তাওহীদ পন্থী। আমি এটাতে সন্তুষ্ট নই। আমি চিন্তা করলাম কি করা যায়? হঠাৎ মনে হল, আমি তো এক জুমআয় 'যাদু ও যাদুকর' সম্পর্কে খুতবা শুনেছিলাম। ইমাম সাহেব বলেছিলেন, যাদুকর শয়তানের সাহায্য নিয়ে থাকে। আর আল্লাহ্‌র যিকির করলে শয়তানের কৌশল বাতিল হয়ে যায়, তার শক্তি নি:শেষ হয়ে যায়। তখন আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম। এদিকে বিস্ময়ভূত মানুষ করতালি দিচ্ছে। আমার এগোনো দেখে তারা ভাবছে আমি অধিক বিস্ময়ের কারণে যাদুকের দিকে নিকটবর্তী হচ্ছি। আমি যখন মঞ্চের নিকটে নিয়ে যাদুকরের কাছে পৌঁছে গেলাম তখন তার দিকে দৃষ্টিপাত করে পাঠ করতে লাগলাম আয়াতাল কুরসী: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ....) দেখা গেল যাদুকর মহিলাটি কাঁপতে লাগল.. কাঁপতে লাগল.. এবং আল্লাহ্‌র শপথ আয়াত পড়া শেষ হল না সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং কাঁপতে থাকল। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। মাহিলাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا "নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত্র দুর্বল।" (সূরা নিসা- ৭৬) তিনি আরো বলেন, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ "তারা কৌশল করে, আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলকারী।" (সূরা আল ইমরান- ৫৪)

মূর্তী.. ভাস্কর্য.. স্মৃতিসৌধ.. প্রভৃতি সম্মান করা

মূর্তী.. ভাস্কর্য.. স্মৃতিসৌধ.. প্রভৃতিকে সম্মান করা শির্কের অন্যতম মাধ্যম..। মূর্তী অর্থ- মানুষ বা প্রাণীর আকৃতিতে প্রস্তুত প্রতিকৃতি। ভাস্কর্য বলা হয়, নেতা বা মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণার্থে নির্মীত প্রতিকৃতিকে। সাধারণতঃ এসমস্ত মূর্তী প্রকাশ্য স্থানে, বড় রাস্তায়, চৌরাস্তার মোড়ে রাখা হয়। স্মৃতিসৌধ বলা হয়- বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নির্মীত সৌধ বিশেষ। পৃথিবীতে তো শির্কের সূচনা হয় এসমস্ত মূর্তী ভাস্কর্যকে কেন্দ্র করেই। তুমি কি দেখোনি নূহ (আ:)এর সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তাদের বিশিষ্ট লোকদের মূর্তী তৈরী করল, তখন খুব বেশী দিন যেতে না যেতে তারা কিভাবে তাদের ইবাদত করতে শুরু করে দিল?

এজন্যই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূর্তী স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন ছবি, চিত্র.. ঝুলিয়ে রাখতে। কেননা তা শির্কের দরজাকে উম্মুক্ত করে; বরং তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিত্রকরদের প্রতি অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেছেন এরা ক্বিয়ামত দিবসে সর্বাধিক কঠিন আযাবের সম্মুখিন হবে। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত ছবি, মূর্তীকে মিটিয়ে ফেলতে। তিনি আরো বলেছেন যে গৃহে ছবি বা মূর্তী থাকে সেখানে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না।

বিদআতী ওসীলা

যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মর্যাদার ওসীলা করা বা কোন সৃষ্টির সত্বার ওসীলা করা, অথবা কোন মৃতের কাছে দু'আ চাওয়া বা শাফা'আত চাওয়া... প্রভৃতি শির্কের অন্যতম মাধ্যম। দু'আয় এরূপ বলা জায়েয নয়: হে আল্লাহ্ তোমার নবীর মর্যাদার ওসীলা চাইছি। অথবা এরূপ বলা বৈধ নয়: হে আল্লাহ্ উমুকের দোহাই দিয়ে বা উমুক মৃত পীরের ওসীলায় তোমার কাছে চাইছি... এগুলো সবই নাজায়েয কথা।

শরীয়ত সম্মত ওসীলা তিন প্রকার:

১) আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ওসীলা করা। যেমন এরূপ বলা বৈধ: (يَا رَحِيْم ارْحَمْنِيْ، يَا غَفُوْرُ اغْفِرْلِيْ) "হে করুণাময় আমাকে করুণা কর। হে ক্ষমাশীল আমাকে ক্ষমা কর।"

২) ঈমান এবং সৎ আমলের ওসীলা করা। যেমন: (اللهُمَّ بِإِيْمَانِيْ بِكَ وتَصْدِيْقِيْ لِرُسُلِكَ أدْخِلْنِيْ جَنَّتَكَ) "হে আল্লাহ্ আপনার প্রতি আমার ঈমান এবং আপনার রাসূলকে সত্যপ্রতিপন্ন করার ওসীলায় আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।"

৩) জীবিত সৎলোকের দু'আর ওসীলা করা। যেমন: কোন সৎ লোককে বলবে তিনি যেন তার জন্য দু'আ করেন। কেননা মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে তা কবূল হয়ে থাকে। কিন্তু কোন মৃতের কবরের কাছে গিয়ে তার কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয নয়।

এগুলো পূর্বে যা উল্লেখ করা হল তা সবই আল্লাহ্র অধিকারের সাথে জড়িত। গাইরুল্লাহ্র জন্য কোন কিছু ব্যয় করা শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

ঈমানের রুকন সমূহ

১) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান

এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর রব বা পালনকর্তা। তিনিই সব ধরণের ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾

"তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শূরা- ১১)
আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা যা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি এরশাদ করেন:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"আল্লাহ্ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেছেন।" (সূরা নিসা- ১৬৪) কুরআনসহ সমস্ত আসমানী কিতাব আল্লাহ্র বাণী।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বসত্বায় ও গুণাবলীতে সমস্ত সৃষ্টির উর্ধে। তিনি ছয় দিনে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর আর্‌শে আযীমে উন্নীত হয়েছেন। আর্‌শে তাঁর অবস্থান কিভাবে তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। তিনি সপ্তাকাশের উপর আর্‌শে আযীমে অবস্থান করা সত্বেও সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অবস্থা অবগত। তাদের সব কথা শুনেন, তাদের কর্ম অবলোকন করেন, যাবতীয়

বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, মু'মিনগণ ক্বিয়ামত দিবসে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

"সে দিন কতিপয় মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার দিকে দৃষ্টিপাত করবে।" (সূরা- ক্বিয়ামাহ্- ২২, ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে নিজের গুণাবলীর ব্যাপারে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র গুণাবলীর ব্যাপারে হাদীছের মধ্যে যে সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি। এ সমস্ত গুণাবলীর প্রকৃত অর্থের প্রতি- আল্লাহ্র শানে যেভাবে প্রযোজ্য হয়- আমরা সেভাবেই বিশ্বাস পোষণ করি। কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা বিকৃতির প্রশ্রয় নেই না।

২) ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমানঃ

আল্লাহ্ তাঁদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কর্ম বন্টন করে দিয়েছেন। নিষ্ঠার সাথে তাঁরা তা পালন করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্র বান্দা। কখনই তাঁর নির্দেশের অবাধ্যতা করেন না। ফেরেস্তাদের সংখ্যা অগণীত। তাঁরা সর্বাধিক আল্লাহকে ভয় করেন এবং সবচাইতে বেশী তাঁর ইবাদত করেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আসমানে 'বায়তুল মা'মূর' নামে একটি ঘর আছে। তার মধ্যে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা ছালাত আদায় করেন। তারা ছালাত শেষে বের হওয়ার পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর সেখানে ফিরে আসার সুযোগ পান না।"

আবূ দাঊদ ও ত্ববরাণীতে ছহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ) "আল্লাহ্র ফেরেশ্তাদের মধ্যে থেকে আরশ বহণকারী একজন ফেরেস্তার বিবরণ দেয়ার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে। তার কানের নিম্নাংশ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাত'শ বছরের রাস্তা বরাবর দূরত্ব।" (আবূ দাঊদ)

বিভিন্ন ফেরেস্তার জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্ম বন্টন করা আছেঃ

যেমন জিবরীল (আ:) নবী-রাসূলদের কাছে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্বে নিয়োজিত। মিকাঈল (আ:) বৃষ্টি এবং উদ্ভিদের দায়িত্বে নিয়োজিত। ইসরাফীল (আ:) ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্বে নিয়োজিত। মালাকুল মওত ফেরেস্তা প্রাণীকুলের জান কবজের দায়িত্বে নিয়োজিত। মালেক ফেরেস্তা জাহান্নামের দারোগা হিসেবে নিয়োজিত।

কোন কোন ফেরেস্তা মাতৃগর্ভে ভ্রুণের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যরা আদম সন্তানের হেফাযতের কাজে নিয়োজিত। তাদের মধ্যে মানুষের আমল লিখনের দায়িত্ব অর্পিত আছে কোন কোন ফেরেস্তার উপর। কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার জন্যও দু'জন ফেরেস্তা নিয়োগ করা আছে...।

এই হল ফেরেস্তাদের পরিচয়। ফেরস্তাদের জগত অদৃশ্য। আমরা যদিও তাদেরকে না দেখি তবুও তাদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান রেখে থাকি।

এছাড়া আরো অদৃশ্য সৃষ্টি রয়েছে। তারা হল জ্বিন জাতি। এরা আগুনের তৈরী। মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾

"নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুস্ক ঠন্‌ঠনে মাটি হতে। এর পূর্বে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে।" (সূরা হিজর- ২৬)

এরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ব্যাপারে নির্দেশিত। তাদের মধ্যে কেউ মু'মিন কেউ কাফের। কেউ আনুগত্যকারী কেউ গুণাহ্‌গার। এরা কখনো মানুষের উপর অত্যাচার করে থাকে। আবার মানুষও কখনো জ্বিনদের উপর অন্যায় করে থাকে। যেমন: হাড্ডি বা গোবর দিয়ে ইস্‌তেঞ্জা করার মাধ্যমে মানুষ তাদের উপর যুলুম করে থাকে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাড্ডি ও গোবর সম্পর্কে বলেন, "তোমরা এ দু'টি বস্তু দিয়ে শৌচকার্য কর না।" কেননা হাড্ডি জ্বিন জাতির খাদ্য আর গোবর জ্বিনদের প্রাণীকুলের খাদ্য। (মুসলিম)

মানুষের উপর জ্বিনদের শত্রুতা: যেমন- মানুষকে কুমন্ত্রনা দেয়া, তাদেরকে ভয় দেখানো, রোগাক্রান্ত করা.. ইত্যাদি।

তবে হাদীছ থেকে প্রমাণিত দু'আ বা যিকির-আযকারের মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তি জ্বিনের অনিষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন- আয়াতুল কুরসী

পাঠ করা, মুআব্বেযাত (সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস) পাঠ করা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত অন্যান্য দু'আ-যিকির সমূহ পাঠ করা। এগুলো ছেড়ে দিয়ে জ্বিনদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দেয়া, তাদেরকে ডাকা প্রভৃতি শির্কের পর্যায়ভূক্ত।

সন্দেহ নেই জ্বিন-শয়তান দুর্বল। তাদের ষড়যন্ত্র দুর্বল। কিন্তু মানুষের মাঝে যখন পাপের হার বৃদ্ধি পায়.. টিভি, ডিশ, ভিডিও প্রভৃতির মাধ্যমে হারাম দৃশ্য অবলোকন করে.. গান-বাদ্যে লিপ্ত হয়.. তখন ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরে, তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়, দু'আ ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করে না... আর তখন শয়তান তার উপর বিজয়ী হয় এবং সহজেই তাকে বিভ্রান্ত করে, বিপদগ্রস্থ করে। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান এবং তার বাহিনী সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾

"তার (শয়তানের) আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা সঠিকভাবে ঈমান রাখে এবং স্বীয় পালনকর্তার উপর ভরসা করে। তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।" (সূরা নাহাল- ৯৯-১০০)

৩) আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমানঃ

আসমানী কিতাব বলতে সেই সমস্ত পুস্তক বুঝায়- আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টিকুলের হেদায়াতের জন্য তাঁর নবীদের প্রতি অবতরণ করেছেন। এগুলোর সংখ্যা অনেক। আমরা সবগুলোর প্রতি ঈমান রাখি। এর মধ্যে মাত্র চারটি সম্পর্কে আল্লাহ্ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। কুরআন নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর। তাওরাত মূসা (আ:)এর উপর। ইঞ্জিল ঈসা (আ:)এর উপর। এবং যাবুর দাঊদ (আ:)এর উপর। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থের সারসংক্ষেপ এর মধ্যে বিদ্যমান। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

"আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" (সূরা মায়েদা- ৪৮)

৪) নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান:

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মিশন ছিল- মানুষকে একথার প্রতি আহ্বান করা: তোমরা এককভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। সর্বপ্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ (আ:) ও সর্বশেষ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

নবী-রাসূলদের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কতিপয় নবীর নাম ও তাঁদের ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। আর অধিকাংশেরই নাম উল্লেখ করেন নি। আমরা সবার প্রতিই ঈমান রাখি। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

"আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।" (সূরা আল মু'মিন- ৭৮) তাঁরা আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষ্য জাতির অন্তর্গত। তাঁদের মাঝে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এতটুকুই পার্থক্য যে, তাঁদের কাছে ওহী করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

"বলুন আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ তবে আমার কাছে ওহী করা হয়।" (সূরা কাহাফ- ১১০) হ্যাঁ তাঁরা মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন। অসুস্থ হন মৃত্যু বরণ করেন। তাঁদের ব্যাপারে এসব কিছুর প্রতি ঈমান রাখতে হবে।

তাঁদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে কাফের; বরং সমস্ত রাসূলকে অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ:)এর কওম সম্পর্কে বলেন, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ "নূহের জাতি রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।" (সূরা শুআ'রা- ১০৫) হূদ (আ:)এর জাতি সম্পর্কে বলেন, كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ "আ'দ জাতি রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।" (সূরা শুআ'রা- ১২৩) অথচ এ সমস্ত লোক শুধু তাদের নবীদেরকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু যেহেতু সমস্ত নবীদের মিশন একই ছিল; তাই তাঁদের

একজনকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে সমস্ত নবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বলে গণ্য হবে।

এভিত্তিতে খৃষ্টানদের মধ্যে যারা নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁর অনুসরণ করে নি; তারা প্রকৃতান্তরে ঈসা বিন মারইয়ামকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং তারা কাফের। কেননা তিনি তাদেরকে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আগমণ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর অনুসরণ করার। কিন্তু তারা তা করে নি। এরূপই কথা হল ইহুদী ও অন্যদের সম্পর্কে।

৫) শেষ দিবসের প্রতি ঈমান:

মৃত্যুর পর যা ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যা উল্লেখ করেছেন বা তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে যা বলেছেন তার সবকিছু বিশ্বাস করা। প্রথমে আমরা বিশ্বাস করব কবরের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে। কবরের শাস্তি বা শান্তি কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"আর ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল, সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।" (সূরা মু'মিন- ৪৫- ৪৬)

আল্লাহ্ মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেন:

﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

"তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ভীষণ আযাবের দিকে।" (সূরা তাওবা- ১০১) আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা:) এবং অন্যরা বলেন, প্রথম আযাব হল দুনিয়াতে, দ্বিতীয়টি হল কবরের আযাব, এরপর ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের ভীষণ শাস্তির দিকে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়েম (র:) বলেন এ সম্পর্কে হাদীছ সমূহ মুতাওয়াতের পর্যায়ের। (তথা সন্দেহাতীত সনদে প্রমাণিত।) এ সম্পর্কে পঞ্চাশোর্ধ হাদীছ রয়েছে। তম্মধ্যে একটি:

(أن النبي ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أماَّ أحَدُهُماَ فكَاَنَ لاَ يَسْتَتِــــرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأماَّ الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা দু'টি কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যাঁ উহা বড় পাপই তো। তাদের একজন চুগলখোর (যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যকে বলে বেড়ায়- উভয়ের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে) ছিল। আর অপরজন নিজেকে পেশাব থেকে পবিত্র রাখত না।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর একটি হাদীছ: রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করতেন: **(اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْــــرِ)** "হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (বুখারী ও মুসলিম)

কবরের শাস্তি বা শান্তি বিষয়টি গায়েবী তথা অদৃশ্যের বিষয়। বিবেক দিয়ে তা বিচার করা সম্ভব নয়।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অন্তর্গত হল:

পূনরুত্থান তথা শিংগায় ফুৎকারের সময় মৃতদের পূণরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা। সে সময় সকলেই উলঙ্গ, নগ্নপদ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

"এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।" (সূরা মু'মিনূন- ১৫-১৬)

হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদানের প্রতি ঈমান রাখা। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾

"নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। তারপর আমার উপরই তাদের হিসাব-নিকাশ (গ্রহণের ভার)।" (সূরা গাশিয়া ২৫-২৬)

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান রাখা। জান্নাত আল্লাহ্ ভীরুদের আবাসস্থল। এর মধ্যে এমন বস্তু রয়েছে যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, সে সম্পর্কে কোন কান শোনে নি, আর না কোন মানুষের হৃদয় তা কল্পনা করতে পারে। জাহান্নাম শাস্তির স্থান। কাফের মুনাফেকদের জন্য সেখানে যে শাস্তি রয়েছে যা কল্পনাতীত।

এমনিভাবে ক্বিয়ামতের পূর্বে ছোট-বড় সবধরণের আলামত সম্পর্কে ঈমান রাখতে হবে। যেমন- দাজ্জাল বের হওয়া। আসমান থেকে ঈসা (আ:)এর অবতরণ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যদয়। মাটির ভিতর থেকে একটি প্রাণী বের হওয়া... ইত্যাদি।

শাফাআ'ত, হাউযে কাঊছার, দাঁড়ি-পাল্লা, জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ্র দর্শন... ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও ঈমান রাখতে হবে।

৬) তক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমানঃ

ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান অপরিসীম হওয়ার কারণে প্রতিটি বিষয় সংঘটিত হওয়ার আগেই তিনি সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি বিষয় ব্যাপকভাবে এবং বিশদভাবে তিনি জ্ঞান রাখেন। আর তা লওহে মাহফূযে (সংরক্ষিত কিতাবে) লিখে রেখেছেন। তিনি সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহ্ সমস্ত বস্তু সৃষ্টিকারী এবং তিনি সবকিছুর উপর তত্বাবধায়ক।" (সূরা যুমার- ৬২) এ জগতে যা কিছুই ঘটুক আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তিনি এরশাদ করেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

"নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ক্বামার- ৪৯)

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা ও সামর্থ রয়েছে। সে অনুযায়ী কোন কর্ম বাস্তবায়ন বা পরিত্যাগের সে স্বাধীনতা রাখে। চাইলে সে ওযু করতে বা ছালাত আদায় করতে পারে, ইচ্ছা করলে বিভ্রান্ত হতে পারে বা অশ্লীল কর্মে জড়িতও হতে পারে.. সবক্ষেত্রেই সে স্বাধীন। একারণেই তার হিসাব নেয়া হবে এবং সে

অনুযায়ী তাকে প্রতিদানও দেয়া হবে। সুতরাং কোন ওয়াজিব বিষয় পরিত্যাগ করে বা অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়ে তক্বদীরের দোষ দেয়া বৈধ হবে না।

****

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহঃ

১) ইসলাম ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাঃ

ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ধর্মদ্রোহিতা মুলক কাজ। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

“বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত সমূহ এবং রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? কোন ওযর পেশ কর না, ঈমান গ্রহণ করার পর অবশ্যই তোমরা কাফের হয়ে গেছ।” (সূরা তওবা-৬৫)

বর্তমান কালে কিছু লোক বলে থাকে- ইসলাম পুরাতন ধর্ম এ যুগে তা অচল, অথবা ইসলাম সেকেলে অনগ্রসর ধর্ম, অথবা বলে থাকে আধুনিক আইন-কানুন ইসলামের আইন-কানুন থেকে উত্তম, অথবা বলে থাকে যারা তাওহীদ.. তাওহীদ.. করে, মাজার-দরবার প্রভৃতির বিরোধিতা করে তারা কট্টরপন্থী.. ওয়াহাবী.. মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী..ইত্যাদি। অনেকে দাড়ি নিয়ে পর্দা নিয়ে হাঁসি-ঠাট্টা করে..। এগুলো সবই ঈমান বিধ্বংসী বিষয়।

২) আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত শাসনকার্য পরিচালনা করাঃ

আল্লাহ্র উপর ঈমানের দাবী হল, তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা। সকল শাসক ও বিচারকের উপর আবশ্যক হল কথা-কাজ, ঝগড়া-বিবাদ.. তথা সব ধরণের অধিকার সম্বলিত বিরোধের বিচার-ফায়সালা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী করা। আর প্রজাদের উপরও আবশ্যক হল তারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার কামনা করা। কেননা ঈমান এবং গাইরুল্লাহ্র কাছে বিধান নেয়া এক ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"তোমার রবের কসম তারা ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা পারস্পরিক মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে তোমাকে ফায়সালাকারী না মানবে। অতঃপর তুমি যা ফায়সালা কর সে ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখবে না এবং তার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পন করবে।" (সূরা নিসা- ৬৫) তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾

"আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফায়সালা করবে না, তারাই কাফের।" (সূরা মায়েদাহ্-৪৪) সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয়ে- বেচা-কেনা, চুরির বিচার, ব্যাভিচারের শাস্তি.. ইত্যাদি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করা আবশ্যক। শুধু বিবাহ তালাক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে আল্লাহ্ বিধান মেনে চললে হবে না.. প্রতিটি বিষয় আল্লাহ্র বিধানের কাছে সোপর্দ করতে হবে। যে ব্যক্তি মানুষের জন্য বিধান রচনা করে বলবে এখন আর আল্লাহ্র বিধানের দরকার নেই, অথবা বলবে এ বিধান আল্লাহ্র বিধানের বরাবর, অথবা বলবে এ বিধানই বর্তমান যুগের জন্য অধিক প্রযোজ্য.. তবে সে কাফের। আল্লাহ্ বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

"তাদের কি কোন শরীক দেবতা রয়েছে যারা তাদের জন্য শরীয়ত প্রণয়ন করেছে- যে ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন অনুমতি দেননি?" (সূরা শূরা- ২১) আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"ওরা কি জাহেলী যুগের বিধান চায়? বিশ্বাসী জাতির জন্য আল্লাহ্র চাইতে কে অধিক উত্তম বিধান দিতে পারে?" (সূরা মায়েদাহ্- ৫০) ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহ্ যখন নাযিল করেন:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

"তারা তাদের আলেম ও পাদ্রীদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবাহ্-৩১) তখন আদী বিন হাতেম বলেন, (তিনি তখনও মুসলমান হননি), হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো তাদের ইবাদত করি না? তিনি বললেন, আল্লাহ্

যা হারাম করেছেন তা কি তারা তোমাদের জন্য হারাম করে না? তখন তোমরা উহা হারাম হিসেবে গণ্য কর? আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা কি তারা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয় না? আর তখন তোমরা উহা হারাম গণ্য কর? সে বলল, হ্যাঁ তা করে থাকি। তিনি বললেন, এটাই তো তাদের ইবাদত হল।" (তিরমিযী)

৩) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব বা মু'মীনদের সাথে শত্রুতা:

একথায় কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হল- ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু তথা সমস্ত কাফেরের সাথে শত্রুতা রাখা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক থাকা। যেমনটি আল্লাহ্ এরশাদ করেন:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে?" (সূরা মুমতহিনাহ্- ১) বরং আল্লাহ্ তা'আলা পিতা, ভাই বা আত্মীয় স্বজনের কেউ যদি কাফের থাকে, তাদেরকেও ভালবাসতে নিষেধ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

"তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র।" (সূরা মুজাদালা- ২২) এ অর্থের আরো অনেক আয়াত রয়েছে। সবগুলো থেকে প্রমাণ হয়, কাফেরদেরকে ঘৃণা করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ওয়াজিব। কেননা তারা আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করে, তাঁর দ্বীনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এদ্বীনের অনুসারীদের সাথে বৈরীতা রাখে; সর্বোপরি ইসলাম এবং মুসলমনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। যেমনটি আল্লাহ্ বলেন,

﴿ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون، هَاأَنْتُمْ أُوْلَاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَاب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور،إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ﴾

“তাদের মুখ হতে শত্রুতা প্রকাশ হয়, আর তাদের অন্তর যা গোপন করে তা আরো গুরুতর; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী ব্যক্ত করেছি, যেন তোমরা বুঝতে পার। সাবধান হও! তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে অঙ্গুলিসমূহ দংশন করতে থাকে। তুমি বল, তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন। যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি তোমাদের অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তারা আনন্দিত হয়ে থাকে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না; তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টনকারী।” (সূরা আল্ ইমরান- ১১৮- ১২০)

বর্তমান যুগেও ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের তৎপরতা কারো কাছে গোপন নয়। কিভাবে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। ইসলামের রাস্তাকে বন্ধ করার জন্য বিশাল আকারের অর্থ ব্যয় করছে। নানাভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধ কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানকালে কাফেরদের সাথে কতিপয় মুসলমানের বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত হচ্ছে: দা'ওয়াতী উদ্দেশ্য ছাড়া কাফেরদের সাথে মেলামেশা, তাদের দেশে বসবাস করা, বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই তাদের দেশে ভ্রমণে যাওয়া, জীবনের বিভিন্ন দিকে তাদের সাদৃশ্যাবলম্বন করা। যেমন, তাদের ষ্টাইলে পোষাক-পরিচ্ছেদ পরিধাণ করা.. ইত্যাদি।

৪) ছাহাবায়ে কেরামের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করাঃ

আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন ছাহাবীকে খাট দৃষ্টিতে দেখা বা তাদেরকে গালি-গালাজ করা বা নবী পরিবারের কোন ব্যক্তির ছিদ্রান্বেষণ করা- ঈমান বিধ্বংশকারী বিষয়।

আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ছাহাবীদেরকে ভালবাসি। তাদেরকে ভালবাসতে গিয়ে কোন প্রকার বাড়বাড়ি করি না- না আলী (রা:)কে নিয়ে না অন্য কাউকে নিয়ে। তাদের কারো থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করি না। ছাহাবীদেরকে যারা ঘৃণা করে তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি। ছাহাবীদের বিষয়ে ভাল ছাড়া অন্য কথা বলি না। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

"মুহাজির এবং আনছারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীগণ এবং সঠিকভাবে যারা তাদের অনুসরণ করবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট।" (সূরা তাওবাহ্-১০০)

তবে ছাহাবীদের মধ্যে যে সমস্ত মতবিরোধ বা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি হল- এগুলোর বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা। তাঁরা মানুষ ছিলেন এবং মুজতাহিদ (গবেষক) ছিলেন। তাঁরা ভুলও করেছেন সঠিকও করেছেন। ঐ সময় সংঘটিত ফিৎনা থেকে আল্লাহ্ যেমন আমাদের তরবারীকে বাঁচিয়েছেন, তেমনি আমরাও তাদের সমালোচনা থেকে আমাদের যবানকে হেফাযত করব। আমরা বলি, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই একত্রিত করবেন এবং তাদের মাঝে হক্ব ফায়সালা ও বিচারের ন্যায়দন্ড প্রতিষ্ঠা করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পর তাঁর প্রথম খলীফা বা প্রতিনিধি হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা:)। কেননা তিনি ছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তারপর খলীফা হচ্ছেন হযরত ওমার বিন খাত্তাব (রা:), তারপর উছমান বিন আফ্ফান (রা:) এবং তাঁর পরে আলী বিন আবী তালিব (রা:)।

বিদআত

অর্থাৎ- ইবাদতের নিয়তে কুরআন-সুন্নাহ্ বহির্ভূত কোন আমল করা এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এধরণের অনেক বিদআতের প্রচলন ঘটিয়েছে। যেমন: নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর জম্ম দিবস পালন করা। সে উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল করা, কিয়াম করা। অথবা কোন ওলী বা পীর বা বুযুর্গ ব্যক্তির জম্ম দিবস পালন করা। এগুলো দ্বীনের মাঝে নতুন সৃষ্টি, যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর ছাহাবীদের (রা:) মধ্যে কেউ করেন নি। ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: (مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنا هَذاَ ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُــوَ رَدٌّ) "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (ছহীহ্ বুখারী) তিনি আরো বলেন, (كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُــلُّ بِدْعَــةٍ ضَــلاَلَةٌ) "প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা।" (আহমাদ, নাসাঈ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়া'মত পূর্ণরূপে তোমাদেরকে প্রদান করলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনিত করলাম।" (সূরা মায়েদা- ৩)

মীলাদ বা জম্ম দিবস অনুষ্ঠানের প্রচলন করার দ্বারা তো একথাই বুঝায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেননি। (নাউযুবিল্লাহ্) তাই পরবর্তী যুগের লোকেরা এ সমস্ত ইবাদতের উদ্ভাবন করে আল্লাহ্র নৈকট্য পেতে চায়। এটা কি আল্লাহ্ এবং রাসূলের উপর প্রশ্ন উথাপন নয়?

যে ধর্ম আল্লাহ্ মনোনিত করেছেন মীলাদ মাহফিল যদি তার অন্তর্গত হত, তবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তা উম্মতের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিতেন এবং ছাহবায়ে কেরামও তার প্রতি আমল করতেন। অথচ ওলামায়ে দ্বীন দ্ব্যার্থহীন ভাষায় মীলাদের বিরোধিত করেছেন। কেননা এটি এমন এক ইবাদত যা সম্পূর্ণ নতুন ও বিদআত। বিশেষ করে যখন এর মধ্যে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়.. মাহফিলে নারী-পুরুষ একত্রিত হয়.. বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার ঘটে। কখনো এ ধরণের মাহফিল শির্কে আকবার

(বড় শির্ক) এর পর্যায়ে উপনিত হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে দু'আ চাওয়া, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা, সাহায্য প্রার্থনা, তিনি গায়েব (অদৃশ্যের সংবাদ) জানেন বিশ্বাস করা, তিনি মাহফিলে হাজির হন এ বিশ্বাসে তাঁর সম্মানে দন্ডায়মান হয়ে 'ক্বিয়াম' করা... ইত্যাদি সবই কুফুরী বিষয়।

যেমন অনেকে বুছীরীর শির্কী কবিতা পাঠ করে:

হে সৃষ্টি সেরা, তুমি ছাড়া কার কাছে আমি আশ্রয় নিব?
তুমি ছাড়া কে আছে বিপদে-আপদে সাহায্য করবে?
ক্বিয়ামত দিবসে তুমি যদি আমার হাত না ধর
তাহলে তো আমি পা ফসকে জাহান্নামে চলে যাব।
দুনিয়ার মহাত্ম ও ক্ষয়-ক্ষতি তোমার মাধ্যমেই
লওহ-কলমের সমস্ত জ্ঞান তো তোমার জ্ঞানের ভান্ডার থেকে নিসৃত।

উল্লেখিত গুণাবলী তথা অদৃশ্যের জ্ঞান, ক্বিয়ামত দিবসে ক্ষমা, দুনিয়া-আখেরাতের কর্তৃত্ব তো শুধুমাত্র সেই মহান সত্বা আল্লাহ্র জন্যেই সমিচীন যাঁর হাতে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব। তরাপরও এসমস্ত কথা মীলাদের মাহফিল সমূহে খুব বেশী শোনা যায়।

একটি প্রশ্ন: অনেকে বলে থাকে- এধরণের মাহফিলে তো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা স্মরণ করা হয়, তাঁর পবিত্র জীবনীর উপর আলোচনা করা হয়?

জবাব: আমরা বলব, ভাল কথা; কিন্তু নবীজির স্মরণ তাঁর সীরাতের আলোচনা তো বছরের যে কোন সময় করা যায়। সারা বছরের মধ্যে একটি দিন নির্দিষ্ট করে এগুলো করার অর্থ কি? জুমআর খুতবায়, আলোচনা সভায়, সাধারণ দরসে... যে কোন সময় নবীজির জীবনী আলোচনা করা যায়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর, তবে (ফায়সালার জন্য) তা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (সূরা নিসা- ৫৯) আমরা মীলাদ মাহফিলের বিষয়টি আল্লাহ্র কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করতে গিয়ে দেখতে পাই- কুরআন আমাদেরকে আদেশ করছে নবীজির অনুসরণ করার এবং ঘোষণা দিচ্ছে যে, দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছের মাধ্যমে মীলাদ মাহফিলের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখি তিনি কখনো

এধরণের মাহফিল করেননি, কোন নির্দেশও দেননি। তাঁর ছাহাবায়ে কেরামও কখনো এরূপ মাহফিল অনুষ্ঠিত করেননি। এথেকে আমরা জানলাম এ কাজ দ্বীনে হক্বের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং এটি একটি নতুন কাজ- বিদআত। বরং বিষয়টি ইহুদী খৃষ্টানদের ধর্মোৎসবের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং কোন বিবেকবান মানুষের জন্য সমিচীন নয় যে, অনেক মানুষ মীলাদ মাহফিল করে, তাই সেও তাদের ধোকায় পড়ে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

“যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর; তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে।”

আশ্চর্যের বিষয়

অনেক মানুষ এধরণের বিদআতী মীলাদ মাহফিল গুলোতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যোগদান করে থাকে; অথচ তাদেরকে অনেক সময় ছালাতের জামা’আতে এমনকি জুমআর ছালাতেও অনুপস্থিত দেখা যায়। অনেকের ধারণা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিলে হাজির হন, একারণে তারা তাঁকে স্বাগতঃ জানিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং সালাম পেশ করে.. ‘ইয়া নবী সালামু আলাইকা..’। নিঃসন্দেহে এটি মিথ্যা এবং অজ্ঞতা। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কবর শরীফে রয়েছেন। ক্বিয়ামতের পূর্বে তিনি সেখান থেকে বের হবেন না। আর তাঁর রূহ মোবারক আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত গৃহ ঈল্লীনের মধ্যে রয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ক্বিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হব।” (মুসলিম) হ্যাঁ, নবীজির উপর দরূদ পাঠ তাঁর প্রতি সালাম পেশ করা নিঃসন্দেহে নৈকট্যদানকারী সর্বোত্তম আমল সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এবং ফেরেস্তাগণ নবীর উপর ছালাত পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম পেশ কর।” (সূরা আহযাব- ৫৬)

আমরা সবাই জানি, কোন মানুষের ঈমান পূর্ণ হবে না, যে পর্যন্ত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভাল না বাসবে, তাঁকে সম্মান না করবে। আর তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান করার অর্থ হল, তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করা, একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করা। সুতরাং ইবাদত করতে গিয়ে তাঁর শরীয়তকে ডিঙ্গিয়ে যেন আমরা কোন কিছু না করতে যাই। আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলুন! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ অতিব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আল্ ইমরান- ৩১)

২৭শে রামাযানের রাতে মাহফিল করা

রামাযান মাস উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত হল অধিকহারে ইবাদত বন্দেগী করা। বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশকে তিনি খুব বেশী ইবাদত করার প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি এরশাদ করেন,

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

"যে ব্যক্তি রামাযানের রাতে ক্বিয়াম (তারাবীহ্ ছালাত আদায়) করবে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় তার পূর্বের পাপরাশী ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ক্বিয়াম (নফল ছালাত আদায়) করবে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রামাযান মাস এবং লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে এ হল নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশনা। কিন্তু ২৭শে রাতকে লাইলাতুল ক্বদর ভেবে সে উপলক্ষে মাহফিল করা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াত নয়। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে সে রাতে কোন মাহফিল করা নিঃসন্দেহে একটি বিদআত। লাইলাতুল ক্বদর ২৭শে রাতে হতে পারে, অন্য কোন রাতেও হতে পারে। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) "তোমরা উহা (লায়লাতুল ক্বদর) রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

শবে মে'রাজ উদ্‌যাপন

নি:সন্দেহে ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সত্য নবী হওয়ার অন্যতম একটি দলীল। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে ইসরা ও মেরাজের ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যে রাতে মে'রাজ হয়েছিল তার নির্দিষ্ট তারিখ কথা কোন ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়নি- না রজবের কথা প্রমাণিত না অন্য কোন মাসের কথা। যদি নির্দিষ্ট তারিখ প্রমাণিত হয়-ও তবুও এ রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন ইবাদত করা বা অনুষ্ঠান করা জায়েয হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা ছাহাবায়ে কেরাম (রা:) এরাতকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান করেননি বা সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনাও দেন নি। অথচ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাত পৌঁছিয়েছেন এবং স্বীয় আমানতও যথাযথভাবে আদায় করেছেন। যদি এরাতকে সম্মান করা এবং তা নিয়ে অনুষ্ঠান করা দ্বীনের অন্তর্গত হত, তবে তিনি অবশ্যই তা আমাদের জন্য বর্ণনা করে দিতেন।

শবে বরাত উদযাপন

এ ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। এর ফযীলতে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই যঈফ বা দুর্বল। বিধায় তার উপর নির্ভর করা বৈধ হবে না। আর এরাতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীছ পাওয়া যায় তার সবকটিই মওযু বা জাল। যেমনটি ইবনু রজব সতর্ক করেছেন। ইবনু ওয্‌যাহ্ (র:) যায়দ বিন আসলাম (র:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "আমরা এমন কোন শায়খ বা ফিকাহ্‌বিদ পাইনি যারা মধ্য শাবানে (বিশেষ কোন ইবাদতের) প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।"

****

এক নযরে ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ

বিদ্যানগণ উল্লেখ করেছেন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহের কোন একটিতে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি কখনো মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। যার কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়।

ইসলাম বিনষ্টকারী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ভয়ানক বিষয়গুলো হচ্ছে দশটি:

১) আল্লাহ্‌র ইবাদতে শির্ক করা। (শির্কের বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে)

২) যে ব্যক্তি তার এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কাউকে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করে, তাকে আহ্বান করে বা সুপারিশ চায় বা তার উপর ভরসা রাখে.. তবে সে আলেমদের ঐকমতে কাফের।

৩) যে ব্যক্তি কাফের-মুশরিকদেরকে কাফের বলবে না বা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে বা তাদের ধর্মকে সত্যায়ন করবে- সে কাফের। কেননা যে কেউ ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে না সে কাফের। চাই সে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান বা বৌদ্ধ বা অন্য কিছু। চাই সে নিকটের লোক হোক বা দুরের।

৪) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধান ব্যতীত অন্যের বিধান পূর্ণাঙ্গ বা উত্তম- যেমন অনেকে তাগূতদের বিধানকে নবীজির বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে- সে কাফের।

একথার অন্তর্গত হল, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, মানুষের তৈরী আইন-কানুন ইসলামী শরীয়তের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা তার বরাবর বা ঐ আইনের কাছে বিচার প্রার্থনা করা জায়েয [যদিও বিশ্বাস করে যে ইসলামী শরীয়তের বিধান উত্তম] অথবা বিশ্বাস করে যে, ইসলামী কলা-কানূন বিংশ শতাব্দীতে কার্যকর করা উপযুক্ত নয়, বা এটা হল মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ, বা এধর্মের সীমাবদ্ধতা শুধু ব্যক্তি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট- জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়- তবেও সে কাফের।

এমনিভাবে কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহ্‌র বিধান- চোরের হাত কাটা বা বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করা (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) বর্তমান যুগের জন্য উপযুক্ত নয়- সেও কাফের।

এরকমই বিধান হল ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস করে যে, লেনদেন বা দন্ডবিধির ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহর বিধান কার্যকর করা বৈধ- যদিও শরীয়তের বিধানের চাইতে উক্ত বিধানকে উত্তম বিশ্বাস না করে। কেননা এর দ্বারা হতে পারে সে আল্লাহ্‌র হারাম বিষয়কে হালাল করে নিবে। আর আল্লাহ্‌ যা হারাম করেছেন- যে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দ্বীনের একটি অতি যরুরী বিষয়- যেমন, ব্যভিচার, মদ, সুদ, গাইরুল্লাহ্‌র বিধান মানা... ইত্যাদি- তা যদি কেউ হালাল ঘোষণা করে তবে সে মুসলমানদের ঐকমতে কাফির।

৫) রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্মের কোন বিষয়কে কেউ যদি ঘৃণা করে তবে সে কাফের। যদিও সে বাহ্যিকভাবে তার প্রতি আমল করে। আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"এ কারণে যে তারা ঘৃণা করে আল্লাহ্‌ যা (কিতাব ও বিধান) নাযিল করেছেন, তাই আল্লাহ্‌ তাদের কর্মসমূহ বাতিল করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ- ৯)

৬) যে ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের কোন বিষয় বা ছওয়াব বা শাস্তি.. ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে সে কাফের। দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"বলুন! তোমরা কি আল্লাহ্‌, তাঁর নিদর্শন সমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না, ঈমান গ্রহণের পর তোমরা (এর মাধ্যমে) কাফের হয়ে গেছো। (সূরা তাওবাহ্‌- ৬৫, ৬৬)

৭) যাদু এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় (যেমন, যাদু দ্বারা স্বামী বা স্ত্রীর জন্য এমন কিছু করা যাতে একজন অপরজনকে ঘৃণা করে। বা এমন কিছু করা যাতে একজন অপরজনকে বেশী ভালবাসে।) যে ব্যক্তি এগুলো করবে অথবা তাতে সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফের হয়ে যাবে। দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"তারা দু'জন (হারূত-মারূত) যাদেরকেই যাদু শিক্ষা দিত, বলে দিত, আমরা তোমাদের জন্য ফিৎনা স্বরূপ, তোমরা (আমাদের কাছে যাদু শিখে) কুফরী করো না।" (সূরা বাক্বারা- ১০২)

৮) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা। মুসলমানদের বিরূদ্ধে কাফের-মুশরিকদের সাথ দেয়া এবং তাদের সাহায্য করা। দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" (সূরা মায়েদাহ্‌- ৫১)

১০) যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখবে যে, তার জন্য মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শরীয়তের বিধি-বিধান থেকে বাইরে থাকার উপায় আছে, যেমন মূসার (আ:) শরীয়ত থেকে খিজিরের বাইরে থাকার সুযোগ ছিল। যেমনটি ছূফী মতবাদের কিছু লোক এধারণা করে থাকে যে, তাদের থেকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ রহিত- তবে সে কাফের। দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসেবে অনুসন্ধান করবে, তার নিকট থেকে তা কবূল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সূরা আল্‌ ইমরান- ৮৫)

১১) আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমূখ থাকা। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে না, তদানুযায়ী আমলও করবে না- সে কাফের। দলীল আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে বেশী যালিম (অত্যাচারী) হতে পারে, যাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের আয়াত সমূহ দ্বারা, অতঃপর

সে উহা হতে বিমুখ হয়েছে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা সাজদাহ্- ২২)

একটি গুরুতর অপরাধ

নিশ্চয় একটি বড় গুণাহ্ এবং গুরুতর অপরাধ হল **ছালাত পরিত্যাগ করা**। ছালাত পরিত্যাগকারীগণ শয়তানের সাহায্যকারী, আল্লাহ্র শত্রু, মু'মিনদের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং কাফেরদের ভাই। তাদের হাশর-নশর হবে ফেরাউন হামানের সাথে। তাদের সাথে জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে উলট-পালট করা হবে।

জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَــرْكَ الصَّــلَاةِ) "একজন ব্যক্তির মাঝে এবং কুফর ও শির্কের মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত পরিত্যাগ করা।" (মুসলিম) ইমাম তিরমিযী এবং হাকেম আবদুল্লাহ্ বিন শাক্বীকের বরাতে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

(كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْــرَ الصَّــلَاةِ) "রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ছাহাবীগণ ছালাত ব্যতীত অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে কাউকে কাফের বলতেন না।"

শাইখ ইবনু উছাইমীন (র:) বলেন, "ছালাত পরিত্যাগকারীর উপর যখন এবিধান প্রযোজ্য হবে যে সে কাফের, তখন তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর করতে হবে। তার সাথে কোন মুসলিম নারীর বিবাহ বৈধ হবে না। ছালাত ত্যাগ অবস্থায় যদি বিবাহের আকদ হয়, তবে সে বিবাহ বাতিল। আর যদি বিবাহের আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর ছালাত ত্যাগ শুরু করে, তাহলে তার বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে- উক্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। ছালাত পরিত্যাগকারীর যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া যাবে না। কেননা তা হারাম। সে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। কোন নিকটাত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তার মীরাছ লাভ করবে না। তার মৃত্যু হলে গোসল, কাফন এবং জানাযা ছাড়াই দাফন করতে হবে, তবে মুসলমানদের গোরস্থানে নয়। ক্বিয়ামত দিবসে কাফেরদের সাথে তার হাশর-নশর হবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তার পরিবারের কারো

জন্য বৈধ নয় তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করা। কেননা সে কাফের। আর মৃত্যুক্ষণে ছালাত ত্যাগীর অবস্থা খুবই নিকৃষ্ট ভয়ানক।"

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম জনৈক মুমূর্ষু ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেন। সে ছিল অশ্লীলতায় লিপ্ত একজন পাপাচারী এবং আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে লংঘনকারী। মৃত্যু যন্ত্রনা তার শুরু হয়েছে। তা দেখে লোকেরা ভীত হয়ে গেল। সবাই চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করাতে লাগল। কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার জন্য তালক্বীন[১] দিতে লাগল। কিন্তু সে নিজের কথা আওড়াতে থাকলো। যখন তার প্রাণ বায়ু বের হতে শুরু করেছে এমন সময় চিৎকার করে উঠল: বলল, আমি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলব? 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আমার কি উপকার করবে? আমি আল্লাহ্র জন্য তো কোন দিন ছালাত আদায় করিনি। তারপর সে ভয়ানক চিৎকার করে উঠল, শেষে মৃত্যু বরণ করল।

আমের বিন আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (র:) মৃত্যু শয্যায় শায়িত। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসগুলো গণনা করছেন। পরিবারের লোকেরা চারপাশে কান্নাকাটি করছে। তিনি যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন এমন সময় শুনতে পেলেন মুআয্যিন মাগরিব ছালাতের আযান দিচ্ছে। আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে পড়েছে। অবস্থা খুবই সঙ্গীন। মৃত্যুর বিপদ খুবই বড়। এমতাবস্থায় তিনি আযানের ধ্বনী শুনে চারপাশের লোকদের বলছেন, তোমরা আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চল। তারা বলল, কোথায়? তিনি বলছেন, মসজিদের দিকে! তারা বলল আপনার এ অবস্থা তারপরও? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমি আযানের ধ্বনী শুনছি; কিন্তু তার জাবাব দিব না? তোমরা আমার হাত ধর। দু'জন লোক তাঁকে মসজিদে বহণ করে নিয়ে গেল। তিনি ইমামের সাথে এক রাকা'আত ছালাত আদায় করলেন। তারপর সিজদা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলেন...।

আত্বা বিন সায়েব বলেন, আমরা আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামীর নিকট আগমণ করলাম। তিনি ছিলেন অসুস্থ। কিন্তু তিনি মসজিদের মধ্যে স্বীয় মুছল্লায় অবস্থান করছিলেন। দেখা গেল মৃত্যু যন্ত্রনা যেন শুরু হয়ে গেছে। আত্মা বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমরা অনুরোধ করলাম, আপনি যদি শয্যা গ্রহণ

---

[১]. অর্থাৎ- উক্ত কালেমা পড়ার জন্য তাকে অনুরোধ করা এবং তার সামনে তা বার বার উচ্চারণ করতে থাকা।

করতেন, তবে বেশী ভাল হত। তিনি নিজ আত্মার উপর ছবর করে বললেন, উমুক ব্যক্তি আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করেছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَةِ ما دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ)

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় মুছল্লায় উপবিষ্ট থেকে ছালাতের অপেক্ষা করবে, সে ছালাত অবস্থাতেই রয়েছে বলে গণ্য হবে।" (বুখারী ও মুসলিম, ভাষ্য মুসলিমের) তাই আমি চাই এ অবস্থায় আমার রূহ কবজ করা হোক যে, আমি মসজিদে বসে ছালাতের অপেক্ষা করছি।

তাই তো যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করেছে, নিজ মাওলার আনুগত্য ধৈর্য সহকারে পালন করেছে। তাঁর রেযামন্দীর সাথেই তার অন্তিম মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে।

সা'দ বিন মু'আয (রা:) একনিষ্ঠ সৎ ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন ইবাদত গুজার ও পরহেজগার। রাতে তিনি পরিচিত ছিলেন শেষরাতের ক্রন্দনকারী হিসেবে। দিনে পরিচিত ছিলেন ছালাত-ছিয়াম এবং ইস্তেগ্ফারকারী হিসেবে। বানু কুরায়যার যুদ্ধে তিনি আহত হন। অসুস্থ থাকেন বেশ কিছু দিন। অবশেষে মৃত্যু নেমে আসে তাঁর জীবনে। যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে খবর পেলেন, সাথীদেরকে বললেন, চল ওখানে। জাবের (রা:) বলেন, তিনি বের হলেন আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। তিনি এত দ্রুত চলতে লাগলেন যেন আমাদের জুতার ফিতা ছিড়ে যাচ্ছে, গায়ের চাদর পড়ে যাচ্ছে। সাথীগণ এ দ্রুততা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি আশংকা করছি আমাদের আগেই হয়তো ফেরেস্তারা পৌঁছে গিয়ে সা'দকে গোসল দিতে শুরু করবে। যেমনটি হানযালার বেলায় হয়েছিল। শেষে তিনি সা'দের গৃহে পৌঁছে দেখেন তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে গোসল দিচ্ছেন এবং তাঁর মাতা ক্রন্দন করছেন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (كُلُّ بَاكِيَةٍ تَكْذِبُ إلاَّ أُمُّ سَعدٍ) "সা'দের মাতা ব্যতীত সকল ক্রন্দনকারীনী মিথ্যা ক্রন্দন করে।" তারপর সা'দকে নিয়ে যাওয়া হল কবরে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে শেষ বিদায় দিতে চললেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সা'দের চাইতে হালকা কোন লাশ আমরা কখনো বহণ করিনি। তিনি বললেন, হালকা হবে না

কেন- এত এত ফেরেস্তা নাযিল হয়েছে যারা ইতপূর্বে কোন দিন নাযিল হয়নি- ওরা তোমাদের সাথে সা'দের লাশ বহণ করছে। শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! ফেরেস্তাগণ সা'দের রূহ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন এবং তাঁর মরণে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠেছে।

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে তাদের বাসস্থান হল জান্নাতুল ফিরদাউস। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে, সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।” (সূরা কাহাফ- ১০৭/১০৮)

আর একটি বড় অন্যায়

যাকাত আদায় না করা। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)

“স্বর্ণ বা রৌপ্যের মালিক কোন ব্যক্তি যদি তার হক (যাকাত) আদায় না করে, তবে ক্বিয়ামত দিবসে উহা জাহান্নামের আগুনে টেনে লম্বা করা হবে, তারপর তা দোজখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। এরপর তার ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। যখন উহা ঠান্ডা হয়ে যাবে, আবার তা গরম করে শাস্তি দিবে। তা হবে এমন দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান- যে পর্যন্ত বান্দাদের মাঝে ফায়সালা না হয় (তার শাস্তি চলতেই থাকবে)। তারপর সে দেখতে পাবে নিজ ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।”

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আল্লাহ্‌ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তবে ক্বিয়ামত দিবসে উক্ত সম্পদকে টাক বিশিষ্ট বিষধর

একটি বিশাল অজগর সাপে রূপান্তরিত করা হবে, যার দু'চোখের উপর দু'টি কাল ফোটা থাকবে। ক্বিয়ামত দিবসে সে তাকে বেড় দিয়ে ধরবে, তারপর তার উভয় চোয়ালে দংশন করবে আর বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করেন এই আয়াত:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"আল্লাহ্ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দিয়েছেন তারা যেন কৃপণতা করে না ভাবে যে, এটা তাদের জন্য ভাল হবে; বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল হবে। অচিরেই যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছিল তা ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে বেড়ী আকারে (গলায়) পরানো হবে।" (সূরা আল ইমরান- ১৮০)

পরিশেষে

সম্মানিত ভাই!... সম্মানিতা বোন!!

হে আমার জাতি! আল্লাহ্র দাঈর ডাকে সাড়া দাও। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন, তিনি তোমাদের পাপরাশী ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি থেকে পরিত্রান দান করবেন।

আল্লাহ্র শপথ আমি আপনার একজন হিতাকাংখী। এ সত্য আপনার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। আপনি জেনেছেন সত্য দ্বীন একটিই- কয়েকটি নয়। তিনি সেই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, একক, মুখাপেক্ষাহীন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হোক তিনি কখনই তা চান না। তাই আপনি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না- যারা বলে, (إنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلى أمَّةٍ وَإناَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ) "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এই ধর্মের উপর পেয়েছি। নিশ্চয় আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব।" (সূরা যুখরুফ- ২৩) বরং আপনি বলুন, আমরা তাওহীদ পন্থী, আনুগত্যকারী ও অনুসরণকারী।

মাজার ও কবরের কাছে পশু যবেহ করার বা সেখানে শির্কের চার্চা কররার প্রচন্ড ভীড় দেখে আপনি ধোকা খাবেন না। কবরস্থ ব্যক্তিদের ব্যাপারে যে সমস্ত চাকচিক্যময় কথা ওরা রচনা করে- যেমন উমুক ওলী বিপদ উদ্ধার করতে পারেন, উমুক পীরের ওসীলায় আল্লাহ্ দু'আ কবূল করেন- ইত্যাদি কথার জালে যেন আপনি আটকা না পড়েন।

দেখনু না আবু তালেবের অবস্থা! তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতৃব্য ছিলেন। আজীবন তিনি নবীজিকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর জন্য নানান কষ্ট হাঁসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। এমনকি তিনি নবীজিকে বিশ্বাসও করতেন। তিনি এটাও মানতেন যে, ইসলামই সত্য ধর্ম এবং মূর্তী মিথ্যা। এমনকি তিনি কখনো কখনো কবিতা আওড়াতেন:

والله لن يصلوا إليك بجمعهـــم　　حتى أوسد في التـــراب دفيـــنا

ودعوتني وعلمت أنك ناصحي　　فلقد صدقت وكنت فينا أمينا

وعرضت ديناً قد عرفت بأنـــه　　من خيــــر أديــــان البريـــة دينا

لو لا الملامة أو حذار مســـبة　　لوجدتـــني ســـمحاً بذاك مبيناً

'শপথ আল্লাহ্র!
ওরা ক্ষতি করতে পারবে নাকো তোমার
যদিও দাফন হয়ে যায় দেহ মাটিতে আমার।
তোমার আহ্বান- তুমি তো চাও আমার কল্যাণ
তুমি সত্য, তুমি যে আল্ আমীন।
পেশ করেছো এমন ধর্ম
যা পৃথিবীর ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
তিরস্কার ও গালিগালাজের যদি ভয় না থাকতো
আমাকে পেতে সুস্পষ্টভাবে এ দ্বীনের ঘোষণা দিতে।'

কিন্তু এ সত্যের অনুসরণ করতে একটি বিষয়ই তাকে বাধা দিয়েছিল; বাপ-দাদার বিরোধীতা ভীতি। দেখুন তার অবস্থা! তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অতিবৃদ্ধ জীর্ণ শরীর। দুর্বল দেহ। মুমূর্ষু অবস্থা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিয়রে দাঁড়িয়ে তাকে কঠিন জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল। দয়ার নবী বলছেন, চাচা! আপনি শুধু বলুন 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'! বলুন 'লা- ইলাহা

ইল্লাল্লাহ্'! ওদিকে মাথার পাশে দন্ডায়মান কুরায়শের কাফের নেতৃবৃন্দ। যখন তিনি তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করার ইচ্ছা করছেন, তখনই তারা বলছে, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করছেন?! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছেন?! অপরদিকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারবার তাকে অনুরোধ করছেন কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করার জন্য। আর তারা তাকে উদ্বুদ্ধ করছে পূর্বপূরুষের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল- তিনি রয়ে গেলেন বাপ-দাদার ধর্মের উপর.. মূর্তী পুজার উপর.. মহান মালিকের সাথে শির্কের উপর।

মৃত্যু বরণ করলেন। মহাপ্রস্থান হল এ দুনিয়া থেকে। ঠিকানা কোথায়? জাহান্নাম। নিকৃষ্ট বাসস্থান। আল্লাহ্ তো কাফেরদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করা হয়েছে- হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পিতৃব্য (আবু তালেব) আপনাকে ঘিরে রাখতেন এবং সাহায্য করতেন। আপনি কি তার জন্য কিছু উপকারে এসেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের মধ্যে অধিক আগুনের স্থানে পেয়েছি। তারপর তাকে জাহান্নামের কিনারে নিয়ে এসেছি। তার পায়ের নীচে আগুনের দু'টি পাথর রয়েছে যার কারণে তার মগজ টগবগ করে ফুটছে।"

বরং দেখুন না ইবরাহীম (আ:) এর দিকে! তিনি ছিলেন মূর্তী বিচূর্ণকারী, আল্লাহ্র ঘর নির্মাণকারী। আল্লাহ্র পথে নানারকমের বিপদের সম্মুখিন তাঁকে হতে হয়েছে, শাস্তি পেতে হয়েছে। তিনিও ক্বিয়ামত দিবসে তাঁর জন্মদাতা পিতার কোন উপকার করতে পারবেন না। কেননা পিতা মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "ক্বিয়ামত দিবসে ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরের সাক্ষাত পাবেন। তখন আযরের মুখমন্ডল কাল কুৎসিত ও ধুলাবালি মিশ্রিত থাকবে। ইবরাহীম পিতাকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আমার আবাধ্য হবেন না? তখন পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্য হব না। ইবরাহীম বলবেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনি অঙ্গীকার করেছেন পূণরুত্থান দিবসে আপনি আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আমার পিতার দূরাবস্থায় এর চাইতে বড় লাঞ্ছনা আর কি হতে

পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেন, নিশ্চয় আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করেছি।"

হে ভাই! এ সমস্ত বিষয়ে সতর্ক হোন এবং স্মরণ করুন সেই দিনের কথা: "যে দিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই থেকে, তার মাতা এবং পিতা থেকে। পত্নী ও সন্তানদের থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।" সতর্ক হোন সে দিনের জন্য "যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আল্লাহ্র কাছে আসবে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।"

আপনি ফিরে আসুন হক্বের পথে। আহ্বান করুন অপরকে সে পথে। দা'ওয়াত দিন তাওহীদের দিকে।

সবার জন্য আল্লাহ্র কাছে হেদায়াত ও সঠিক পথের প্রার্থনা জানাই।

আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। ছাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা ওয়া বারিক আলা রাসূলিল্লাহ॥

-সমাপ্ত-

অনুগ্রহ পূর্বক বইটি পড়া হলে অন্যকে উপহার দিন অথবা এমন স্থানে রাখুন, যাতে করে মানুষ উপকৃত হতে পারে।